তৃতীয় অধ্যায়

দেবেশ রায়ের উপন্যাসে লোকজীবন ও সংস্কৃতি

বর্তমান সময়ের একজন কিংবদন্তি লেখক দেবেশ রায়। তাঁর জন্ম ১৭ ডিসেম্বর, ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে, পাবনা জেলার বাগমারা গ্রামে। ১৯৪৩-এ তিনি সাত বছর বয়সে গ্রামের বাড়ি থেকে জলপাইগুড়ি চলে আসেন। জলপাইগুড়ি জেলা স্কুল থেকে তাঁর শিক্ষা জীবনের সূচনা এবং এই শহর থেকে কর্মজীবনেরও সূচনা। তিনি পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে লেখনীকে পেশাগতভাবে গ্রহণ করেন। তাঁর সাহিত্য জীবনের শুরু ছোটগল্প দিয়ে হলেও তিনি সাহিত্যের জগতে পরিচিতি লাভ করেন উপন্যাস শিল্পী হিসাবেই। আর একজন সৃষ্টিশীল ঔপন্যাসিক হিসাবে দেবেশ রায় তাঁর রচনায় তুলে ধরেছেন তাঁর পরিচিত ভৌগোলিক পরিবেশ ও সেই অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষজনের জীবনযাত্রাকে, অর্থাৎ উত্তরবঙ্গের মানুষ ও তাদের সংস্কৃতিকে। যার প্রতিফলন ঘটেছে—'আপাতত শান্তিকল্যাণ হয়ে আছে' (১৯৭০), 'মফস্বলি বৃত্তান্ত' (১৯৮০), 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' (১৯৯০), 'তিস্তাপুরাণ' (২০০০) প্রভৃতি উপন্যাসে। ফলে স্বভাবতই এই উপন্যাসগুলিতে স্থান পেয়েছে উত্তরবঙ্গের মানুষজনের পূজা-পার্বণ, লোকাচার, লোকবিশ্বাস, লোককথা, লোকসংগীত, ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ-প্রবচন ইত্যাদি। যার ফলস্বরূপ তাঁর উপন্যাসগুলি হয়ে উঠেছে উত্তরবঙ্গের লোকজীবনের দলিল।

লোকদেবতা: মাসান

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের অন্যতম দেবতা হলেন মাসান। তবে উত্তরবঙ্গের বাইরে আসামের ধুবড়ি, গোয়ালপাড়া, কোকরাঝাড়, নলবাড়ি জেলাতেও মসান লোকদেবতার পূজার প্রচলন রয়েছে। কিংবদন্তি অনুসারে মাসান কালীর ১৮টি সন্তানের মধ্যে জ্যেষ্ঠ সন্তান। ধর্মদেবের ঔরসে কালীর গর্ভে তার জন্ম। একদিন কালী তার পাঁচ বোনকে নিয়ে নদীতে স্নান করছিলেন। সেই সময় ধর্মদেবের আবির্ভাব হয় এবং অতল জলে কালীর সঙ্গে যৌন মিলনের ফলে জন্ম

হয় মাসানের। ড: চারুচন্দ্র সান্যাল তাঁর The Rajbansis of North Bengal গ্রন্থে বলেছেন—

> *"Masan is said to be the offspring of the union of kali(mother) and Dharma (father)"*[১]

জনশ্রুতি অনুসারে মাসানের জন্মের পর ধাই মাসানের নাড়ীকুন্ডুলী জলে ফেলে দেয় এবং সেখানে জন্ম হয় কলমি শাকের। তাই মাসান দেবতাকে সম্মান জানাতে অনেক রাজবংশী পরিবার ভাদ্রমাসে কলমি শাক খায় না। ড. গিরিজাশঙ্কর রায় মাসান সম্পর্কে বলেছেন—

> *"শ্মশান মাশান একটি ব্যাপক প্রচলিত শব্দ। শ্মশানকে মাশানও বলা হইয়া থাকে। সম্ভবত শ্মশানে যে দেবতা বিরাজ করেন সেই দেবতাই পরবর্তীকালে মাশান হইয়াছেন। অর্থাৎ শ্মশানচারী শিবই মাশানের মূলে রহিয়াছে।"*[২]

মাসানের সংখ্যা ও রূপভেদ নিয়েও রয়েছে নানান মতভেদ। ড. চারুচন্দ্র সান্যাল মাসানের ১৬টি রূপের কথা বলেছেন। আবার ড. গিরিজাশঙ্কর রায় মাসানের ১৮টি রূপের কথা বলেছেন। তবে সংখ্যা গরিষ্ঠের মত অনুসারে মাসান ১৮ প্রকার।

১) বাড়িয়া মাসান— এই মাসানের অবস্থান বাড়ির আশেপাশের জঙ্গল বা বাঁশবনে। কেউ কোনো দোষ করলে তার উপর ভর করে।

২) বহতা মাসান— নদী, খাল, বিল, পুকুরের পরিত্যক্ত ভেলার কলাগাছে এই মাসানের আশ্রয়। কেউ ভুল করে এগুলি স্পর্শ করলে তাকে আক্রমণ করে।

৩) ভুলা মাসান— নির্জন মাঠে এই মাসান বাস করে। মানুষকে পথ ভুলিয়ে ডেকে নিয়ে যায়।

৪) ঘাটের মাসান— নদী বা পুকুরের ঘাটে এই মাসানের অবস্থান। সন্ধ্যা কিংবা দুপুরে একা পেলে আক্রমণ করে।

৫) তিসিলা মাসান— এই মাসান জলাভূমিতে বাস করে। ঘাটের মাসানের মতো সন্ধ্যা কিংবা দুপুরে একা পেলে আক্রমণ করে।

৬) কাল মাসান— এই মাসান শ্মশানে বাস করে। দুপুরে, সন্ধ্যায় বা রাতে শ্মশানের পাশ দিয়ে গেলে আক্রমণ করে।

৭) কুহুলী মাসান— এই মাসান গাছে থাকে। কোকিলের সুরে ডেকে পথিককে বিভ্রান্ত করে বিপদে ফেলে।

৮) ন্যাংটিয়া মাসান— এই মাসান সব সময় উলঙ্গ থাকে। এর কোনো নির্দিষ্ট অবস্থান নেই যেখানে সেখানে থাকতে পারে। এই মাসান ধরলে মৃত্যু অবধারিত।

৯) বিষালি মাসান— এই মাসান সর্বত্র বিরাজমান। বিষালি মাসান ধরলে সর্বাঙ্গে ব্যথা হয়।

১০) ড্যামসা মাসান— ঘন বনে ভেজা স্যাঁতস্যাঁতে ঝোপে থাকে। এই মাসান ভর করলে জ্বর হয় ও রোগী কানে কম শোনে।

১১) শুকনা মাসান— এর বসবাসের নির্দিষ্ট স্থান নেই। শুকনা মাসান ধরলে মানুষ রোগা ও ক্ষীণকায় হয়ে যায়।

১২) কলির মাসান— এই মাসান সর্বত্র ঘুরে বেড়ায়। এই মাসান অন্যান্য মাসানের তুলনায় বেশি শক্তিশালী।

১৩) অঙ্গিয়া মাসান— এই মাসান বহুরূপী মাসান নামেও পরিচিত। বিভিন্ন রূপ ধরে ছলনা করে মানুষকে বিপদে ফেলে।

১৪) চান্দিয়া মাসান— এই মাসানের আকৃতি ভয়ঙ্কর ধরনের। এর মাথায় চুল থাকে না, চোখ থাকে বুকে এবং গায়ের রঙ নীল। চান্দিয়া মাসান ধরলে মানুষের মাথার চুল উঠে যায়।

১৫) ওবুয়া মাসান— এর কোনো নির্দিষ্ট স্থান নেই সর্বত্র বিরাজমান। গর্ভবতী নারীকে ওবুয়া মাসান বেশি ধরে।

১৬) ছুঁচিয়া মাসান— ভুলা মাসানের মতো এই মাসানও নির্জন প্রান্তরে বাস করে। ভোরে, সন্ধ্যায়, গভীর রাতে পথযাত্রীকে আক্রমণ করে।

১৭) চলন্তিকা মাসান— রাস্তার ধারের গাছে এই মাসান বাস করে।

১৮) খ্যাতাওড়া মাসান—এই মাসান সর্বত্র বিরাজমান। এই মাসান ধরলে প্রচণ্ড জ্বর হয়।

দেবেশ রায়ের 'মফস্বলি বৃত্তান্ত' উপন্যাসে ভুলা মাসানের উল্লেখ রয়েছে। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র খেতখেতু ক্ষুধার্ত পেটে আলসারের যন্ত্রণা নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছিল, তিনদিন ধরে অভুক্ত পরিবারের জন্য কিছু খাবার ব্যবস্থা করতে। কিন্তু সারাদিন ঘুরে কোনো ধরনের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে না পেরে ক্লান্ত শরীর নিয়ে নির্জন পথে একাকী বাড়ি ফেরার সময় আসিন্দিরের পালান বাড়ি আর রানীমার খাল নিয়ে তার কিছু সংশয় তৈরি হলে ভুলা মাসানের কথা মনে পড়ে।

> *"ছ্যাম-ছ্যামা ধানখেত, শুনশুনা আলি—এই সময়ই ত ভুলা মাসান এসে পথ ভোলায়। খেতখেতুর সন্দেহ হয়, সে কেন মেঘের ছায়ায় আচ্ছন্ন আসিন্দিরের পালান বাড়িকে ভাবল রানীমা-র খাল-ই, এ-রকম ভাবেই ভুলা মাসান পথ ভোলায়, তখন এই ধানখেতের ভেতর পাক দিয়ে-দিয়ে ঘুরতে হবে, পথ পাওয়া যাবে না আর একবার পেছনে তাকালে বা পেছন থেকে কোনো ডাকে সাড়া দিলে সঙ্গে-সঙ্গে ভুলা মাসান এসে ঘাড় মটকে ফেলে রেখে যাবে।"*[৩]

ভুলা মাসান একবার কারো পিছনে পড়লে সে তার পিছনে পিছনে চলতে থাকে। আর যখন ব্যক্তিটি ভুল পথে পা বাড়ায় তখন তাকে আক্রমণ করে। এই মাসান নিজের এলাকার লোকের ক্ষতি করে না। কেননা, ভুলা মাসান সেই সমস্ত মানুষেরই ক্ষতি করে যাদের সে পথ ভুলিয়ে নির্জন প্রান্তরে নিয়ে যেতে পারে। নিজ এলাকার মানুষ-জনের যেহেতু পথ-ঘাট চেনা থাকে তাই সে ক্ষতি করার সাহস পায় না। উপন্যাসে আমরা দেখি, খেতখেতু যখন নিজ এলাকাতেই পথ গুলিয়ে ফেলে সে-সময় তার মনে হয় ভুলা মাসান বুঝি তার পিছনে পড়েছে। ঔপন্যাসিকের বর্ণনায়—

> *"হঠাৎ তার মনে হয়, ভুলা মাসান তার পেছনে ইতিমধ্যে এসে থাকতে পারে, এখন বুঝতে দেবে না, আলের বাঁকে-বাঁকে, ধান গাছের আড়ালে-আড়ালে পেছন-পেছন আসবে। আসলে পরীক্ষা করবে, খেতখেতু এই জায়গার লোক কি না। যদি এই জায়গার লোক বলে বোঝে তাহলে কোনো-এক সময় পেছন থেকে সরে*

যাবে, নিজের জায়গার লোককে মাসান কিছু করে না। কিন্তু যদি বোঝে 'পরদেশী' তাহলে আর রক্ষা নেই; আড়ালে-আড়ালে মাসান ঠিক চলতে থাকবে।"[৪]

এই মাসান পিছু করলে অনেক সময় খুব চেনা গলায় নকল করে ডাকতে পারে আর এই ডাক শুনে কোনো ব্যক্তি পিছনে তাকালে বা দাঁড়িয়ে পড়লে সে দেখতে পাবে চারিদিকে থমথমে পরিবেশ কোথাও কেউ নেই। ব্যক্তিটি যদি ভয় পেয়ে নিজেকে বাঁচাতে তাড়াতাড়ি হেঁটে বা দৌঁড়ে পালাতে চায় তাহলে মাসান তাকে আক্রমণ করে মেরে ফেলবে। সুতরাং মাসান পিছু নিলে এমনভাবে পথ চলতে হবে যাতে করে মাসান বুঝতে পারে তার উপস্থিতি লোকটি বুঝতে পারে নি। মাসানের নজরে পড়লে হাঁটতে হাঁটতে থমকে দাঁড়াতে নেই বা পিছন ফিরে তাকাতে নেই এমন কি পিছন থেকে চেনা গলায় কোনো ডাক আসলেও ফিরে তাকানো বারণ। ঔপন্যাসিকের ভাষায়—

"মাসানের নজরে পড়লে যেমন গতিতে মানুষ সাধারণত হাঁটে তেমনি গতিতে দু-পাশে তাকাতে-তাকাতে হাঁটিতে হবে—যেন নিজের জমিদারি, সামনের বা পাশের দিকে তাকিয়ে মুখ খারাপ করতে হবে, পেছন থেকে খুব চেনা কোনো মানুষের গলায় কেউ ডাকলে বা মুখ খারাপ করলে সামনের দিকে মুখ রেখে, পথ চলতে-চলতেই পাল্টা কথা বা মুখ খারাপ করতে হবে। মুহূর্তের জন্যও যেন মনে না হয় যে সে পরদেশী।"[৫]

মাসান সম্পর্কিত এই কথাগুলি উত্তরবঙ্গের লোকসমাজের কাছে অজানা নয়। আর এই লোকসমাজের একজন হল খেতখেতু। মাসানের হাত থেকে কি করে বাঁচতে হয় সেটা তার ভালো করে জানা আছে। তাই সে কোথাও না দাঁড়িয়ে নির্জন ধান খেতের মাঝখান দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নিজেকে স্থানীয় মানুষ হিসাবে পরিচয় দেওয়ার জন্য বলে—

"মুই খেতখেতু রায়, স্যানং টাইমত খেতখেতু রায় বর্মন, বাপার নাম কান্দুরা, বুড়া বাপার নাম ভাদুরা, গ্রামসভা দ্বারিকামারি, অঞ্চল বাহাদুর, মৌজা বাহাদুর,

পদ্মনাথের আধিয়ার আছিলো, ধর কেনে চারি পুরুষ, এ্যালায় মোর গিরি, গিরি না হয় গিরিনি, অ্যালায় মোর গিরিনির নাম...”[৬]

মালিকের নাম বলতে না পারায় তার ভয় আরো বেড়ে যায়। এই ভয় এতটাই তাকে আঁকড়ে ধরে যে সে আলসারের ব্যথায় মাটিতে বসে পড়লেও মুহূর্তের মধ্যে আবার হামাগুড়ি দিতে দিতে উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটতে থাকে এবং বলে—

“মাসান, মাসান, মোক ছাড়ি দে, মুই ত খেতখেতু মুই এই ঠেকার মানষি, মোর বুড়াবাপা এইঠেকার মানষি আছিল্, হু-ই ত উত্তরপাকে মোর ঘর আর হু-ই ত দক্ষিণ পাকে ইস্কুল, এইটা ত মোর ঘরের আঙিনার নাখান, তুই ত হামারলায় টারির (পাড়ার বা গাঁয়ের) মাসান, মোক ছাড়ি দে—

...মুই পথ ভুল করো নাই মাসান, পথ ভুল করো নাই, মোক আন্ধারিয়া রাতিত্ দুই চক্ষু বান্ধি ছাড়ি দে কেনে, মুই সিধা চলি যাম, ধরো কেনে উত্তরের পাকে ন্যশন্যাল হাই, দক্ষিণের পাকে ধরো কেনে হুই জহুরি কলোনি, পুব পাকে পদ্মনাথের খোলান, পশ্চিম পাকে তালমা নদীর উপরের ভাঙা সাঁকোখান্ মুই চক্ষু বন্ধ করি পার হয়্যা চলি যাম। মাসান, মোক ছাড়ি দে, মুই তোর টারির মানষি।”[৭]

কিন্তু তবুও খেতখেতুর মনে সংশয় থেকে যায়। তার মনে হয় মাসান যেন তার আশপাশে কোথাও আছে। দিনের শেষে দুই হাতে পেট চেপে ধরে কয়েকবার শুকনো ওয়াক তুললে ওয়াকের ভেতর ঢেকুরের সঙ্গে খানিকটা নোনতা জল উঠে আসলেও তাতে তার জিভ ভেজে না। তখন খেতখেতুর মনে হয় মাসান বুঝি তার শরীরের ভেতর ঢুকে শরীরের যেটুকু রস অবশিষ্ট ছিল তা শুকিয়ে ফেলেছে। খেতখেতুর এই ভাবনাগুলির পিছনে রয়েছে তার আদিম সংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতা। প্রত্যন্ত গ্রামে বসবাসকারী খেতখেতুর সঙ্গে আধুনিকতার কোনো সম্পর্ক নেই। তাই তার মননে ও চেতনে বিজ্ঞানভিত্তিক মানসিকতা তৈরি না হওয়ায় ক্ষুধা আর আলসারের যন্ত্রণায় দিগন্ত বিস্তৃত ধান খেতের ভিতর দিয়ে বাড়ি ফেরার সময় হয়তো শারীরিক দুর্বলতার কারণেই মাসান ভ্রমে জড়িয়ে পড়ে। তবে এই ভ্রম যে

কেবল খেতখেতুর মতো নিরক্ষর মানুষদেরই তা নয়, উত্তরবঙ্গের অনেক আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষের মানস জগতেও এই বিশ্বাসের স্থান রয়েছে।

যখ:

সেইসঙ্গে আমরা এই উপন্যাসে 'যখ' নামক আর এক লৌকিক দেবতার সঙ্গে পরিচিত হই। 'যখ' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল– মাটিতে লুকিয়ে রাখা ধনের রক্ষক, অতি কৃপণ ব্যক্তি। যখ নিয়ে লোকমানসের বিশ্বাস হল—সঞ্চিত ধনরত্নসহ যদি কোনো জীবন্ত বালককে ভূগর্ভে সমাধিস্থ করা হয় তাহলে মৃত্যুর পর সেই বালক যক্ষ রূপে উক্ত ধনরাশির রক্ষা করতে পারে। এই পদ্ধতিকে বলা হয় যখ দেওয়া। আবার, কোনো ব্যক্তি প্রচুর ধনসম্পত্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও যদি সে খুব কৃপণ হয়, এমন কি মৃত্যুর পরও সম্পত্তির উপর থেকে লোভ সরিয়ে নিতে না পারে তাহলে তার আত্মার মুক্তি হয় না। তখন সে যখ হয়ে সম্পত্তির পাহারা দেয়। এই যখের সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে ধনদেবতা কুবেরের সম্পত্তি রক্ষক যক্ষের। কেননা যখ ও যক্ষ উভয়েরই কাজ হল ধনের রক্ষা করা। কিন্তু যক্ষ হল দেবতা স্বরূপ আর যখ হল অপদেবতা।

আলোচ্য উপন্যাসে তিনদিন ধরে অভুক্ত থাকা পরিবারের খাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য টুলটুলি যখন ঝুরি কাঁধে নিয়ে বেরোয় কচু, কন্দ বা অন্য কিছু খুঁজে আনতে, সেই সময় তার পিছু নেয় বড় ছেলে বৈশাখু আর ছোট ছেলে বেঙ্গু। এরা দু'জনেই বয়সে খুবই ছোট। একজনের বয়স আট আর একজনের বয়স সাত কিংবা ছয়। মায়ের পিছু পিছু হাঁটতে হাঁটতে কখন যেন তারা মাকে হারিয়ে ফেলে। দিগন্ত বিস্তৃত ধানক্ষেতের মাঝখানে বসে কিছু সময় খেলাধুলা করার পর তারা ক্ষুধার জ্বালা ভুলতে পথ হাঁটতে থাকে। *"বৈশাখু বয়স্ক স্বরে বলে, চল্ কেনে হামরালা হাঁটিবার ধরি, হাঁটিলে আর ভোক পাবে না।"*[৮] কিন্তু তিনদিন ধরে ক্ষুধার্ত শিশুরা কতক্ষণ আর পথ চলতে পারে। ছোট ভাই বেঙ্গু তার দাদা বৈশাখুকে বলে— *"মুই আর হাঁটিবার না পার, তুই যা কেনে, মুই এইঠে থাকিম।"*[৯] এরপর তারা দু'জনে মাঠে বসে বেলা বয়ে যাওয়ার অপেক্ষা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ে। সন্ধ্যার সময়

বৈশাখু ভাই বেঙ্গুকে ঘুম থেকে ডেকে তোলে বাড়ি যাবার জন্য। ঘুম থেকে উঠে বেঙ্গু জানায় সে বাড়ি যাবে না। তখন দাদা বৈশাখু বলে—*"এইঠে থাকিলে ত যখ হবার ধরিবু তুই।"*[১০] এরপর দুই ভাইয়ের মধ্যে যখ নিয়ে যে প্রশ্ন-উত্তর চলে তা থেকে আমরা লোকসমাজের যখ সম্পর্কিত মানসিকতাটি বুঝতে পারি। বেঙ্গু তার দাদাকে বলে—

" 'যখ হইলে কি হয় ?'
'এইঠে তোর মরণ হবে।'
'হছে ত।'
'মরণের পরও এইঠে থাকিবার নাগিবে।'
'কত দিন থাকিবার নাগিবে।'
'আমরণ।' "[১১]

যখ হওয়ার কথা শুনে বেঙ্গু আরো দৃঢ় পরিকল্পনা করে সে আর বাড়ি যাবে না। ধান পাকতে যে সাত-আট দিন বাকি আছে সে কয়েকদিন সে এখানেই থাকবে। কারণ সে যদি ধান পাকার অপেক্ষায় ধানক্ষেতে বসে থাকে তাহলে জীবিত অবস্থাতে না হলেও মরণের পর যখ হয়ে ধান থেকে ভাত হতে দেখতে পারবে, ভাত খেতে পারবে।

" ত অ্যালায় মুই এইঠে মরিলে ধান কাটিবার বাদে যখ হইয়া বাঁচি থাকিম ?'
'থাকিবু।'
'স্যালায় যখ হইয়া ধানের ভাত হওয়া দেখিম ?'
'দেখিবু।'
'ভাত খোয়া পারিম ?'
'পারিবু।' "[১২]

তিস্তাবুড়ি:

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের এক উল্লেখযোগ্য দেবী 'তিস্তাবুড়ি'। তবে কোথাও কোথাও তিনি 'তিস্তামাই' ও 'তিস্তামাতা' নামেও পরিচিত। এই দেবীর

মূর্তি তৈরি হয় পাটকাঠি বা কলা গাছের ডাঁটা দিয়ে। মূলত বৃষ্টির কামনায় এর পূজা করা হয়। এছাড়াও প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও সংক্রামক ব্যাধির হাত থেকে বাঁচতে এবং যেকোনো শুভ কাজের শুরুতে তিস্তাবুড়ির পূজার প্রচলন রয়েছে। এই দেবীর পূজার এক অপরিহার্য অংশ হল নাচ ও গান। যাকে বলা হয় তিস্তাবুড়ির গান বা মেচেনি খেলা। তিস্তাবুড়ির পূজার বিধান অনুসারে চৈত্রমাসে রাজবংশী নারীরা দল বেঁধে গ্রামে গ্রামে ঘুরে মেচেনি খেলে মাগন তুলে। এবং বৈশাখ মাসের বিশেষ কোনো একদিন পূজার আয়োজন করে। এই পূজায় সাধারণত বয়স্ক মহিলারাই অংশগ্রহণ করে থাকে। তবে অল্পবয়স্ক এবং বিধবা মহিলারাও এতে অংশগ্রহণ করতে পারে। পূজার যিনি প্রধান থাকেন তাকে বলা হয় মাড়েয়ানি। যার উপর দায়িত্ব থাকে পূজাটিকে সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার। এই পূজায় 'অধিকারি' অর্থাৎ পুরোহিত থাকে না। পরিবর্তে থাকে 'দেওধাঁ' অর্থাৎ দেবতার প্রতিনিধি। দেওধাঁ ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তির দ্বারা পূজা দিলে সে পূজা সম্পন্ন হয় না।

তিস্তা নদীদেবী। রাজবংশী সমাজে এই দেবীর উদ্ভবের পেছনে রয়েছে তিস্তা নদীর ভীতিজনিত কারণ। ড. জীবেশ নায়ক বলেছেন—*"অনৈসর্গিক শক্তির শুভাশুভ উভয় ক্ষমতাই আছে। অকল্যাণকারিতাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একদা মানুষের মনে তাকে সন্তুষ্ট করার বাসনা জেগেছিল। সেই বাসনাকে রূপায়িত করার জন্য প্রার্থনা বা অনুরূপ প্রক্রিয়া থেকেই পূজার (worship) জন্ম হয়।"*[১৩] উত্তরবঙ্গের একটি প্রধান নদী হল তিস্তা। এই নদী মানুষকে একদিকে যেমন ভয়ংকরী বন্যায় মানুষের সর্বস্ব ভাসিয়ে নেয়, তেমনি অন্যদিকে বন্যার জল কৃষিজমিতে প্রবেশ করে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। অর্থাৎ একদিকে যেমন নেয় তেমন অন্যদিকে দেয়। তাই রাজবংশী জনজাতি তিস্তার ভয়ংকরী রূপ থেকে মুক্তি পেতে এই নদীকে দেবীত্বে বরণ করে 'তিস্তাবুড়ি' নামে পূজা শুরু করে। ড. গিরিজাশঙ্কর রায় তিস্তাবুড়ি সম্পর্কে বলেছেন—

> *"তিস্তাবুড়ি পূজার সৃষ্টির মূলে বন্যা ভীতিও একটি অন্যতম কারণ ছিল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। অন্যদিকে ভূমি উর্বরতা বৃদ্ধির বাসনা, প্লাবনের প্রবলতা*

রোধের কামনা, রোগাদি দূরীকরণের ধারণা প্রভৃতির মধ্যে যে বিষয়টি অত্যন্ত গোপনে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে বলিয়া মনে হয় তাহা হইল কৃষিকেন্দ্রিক যাদুবিশ্বাস।"[১৪]

ঔপন্যাসিক দেবেশ রায় তাঁর 'তিস্তাপুরাণ' ও 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' এই দুই উপন্যাসে তিস্তাবুড়ির উল্লেখ করেছেন। 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' উপন্যাসে নবনির্মিত রাজনৈতিক দল উত্তরখণ্ড পার্টি তাদের আন্দোলনের সফলতার জন্য তিস্তাবুড়ির পূজার আয়োজন করে। ঔপন্যাসিকের বর্ণনায়—

" 'বেটিছোয়ার ঘর ঘুরি-ঘুরি গান গাবার ধরিছে।' একটু দাঁড়িয়ে শুনতেই বাঘারু বোঝে, তিস্তাবুড়ির পুজো হচ্ছে। ওখানে নিশ্চয়ই পাটকাঠি দিয়ে তিস্তাবুড়িও একটা বানানো হয়েছে। গানগুলো খুব মন দিয়ে যে শোনে বাঘারু তা নয়, কিন্তু জন্ম থেকে শুনতে-শুনতে এ গান এতই জানা যে শুনতে না-চাইলেও শোনা হয়ে যায়।

সগ্‌গ হতে নামিল্ তিস্তাবুড়ি
মনচে দিয়া পাওঁ
মনচ হতে নামিল্ তিস্তাবুড়ি
চ্যাতন করিল্ গাও
কাচা দুধ আলোয়া ক্যালো
ভইক্ষণ করো।"[১৫]

গানটি মেচেনি খেলার গান। এই গান ছাড়া তিস্তাবুড়ির পূজা হতে পারে না। তিস্তাবুড়ির পূজার সাথে এর সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। 'তিস্তাপুরাণ' উপন্যাসে দেবেশ রায় মেচেনি খেলার মিথ কথার উল্লেখ করেছেন—

"শিবঠাকুর বেড়াতে-বেড়াতে তিস্তার ওপর-নীচে নানা নদীর পারে ঘুরতে-ঘুরতে ধূপগুড়ির ফুলবাড়িতে মেচেনী-বেটিছোয়াদের দেখে আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না। মেচেনী-বেটিছোয়াদের সঙ্গে শোয়াবসা করতে লাগলেন। মা দুর্গা কৈলাসে সে-সব খবর পেলেন। শিবঠাকুর দেবতা। মা দুর্গাও দেবতা। এক

দেবতার খেলাখেলির মধ্যে তো আর-এক দেবতা ঢুকতে পারেন না। আবার শিবের মত একটা স্বামী পর হয়ে যাবে, এটাও তো সহ্য হয় না। তখন, মা পার্বতী-দুর্গা নিজেই মেচেনীর ঢক ধরে মেচেনী পাড়ায় এলেন। আর শিবঠাকুর এই নতুন মেচেনীর সঙ্গেই শোয়াবসা শুরু করে দিলেন। তাতেই তো কার্তিক-গণেশের জন্ম। ধূপগুড়ির ফুলবাড়িতে। মেচেনী-খেলাই তো তিস্তাবুড়ির পূজা।"[১৬]

'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' উপন্যাসের নবনির্মিত রাজনৈতিক দল উত্তরখণ্ড পার্টির কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে তিস্তা ব্যারেজের নির্মাণ বন্ধ করা। তারা চায় না তিস্তা নদীকে কোনো রূপ বন্ধনে বেধে ফেলা হোক। কেননা, তিস্তা শুধু নদী নয়, তিস্তা তাদের আরাধ্য দেবী। তিস্তা নদীর উপর ব্যারেজ তৈরি হলে তিস্তা মায়ের অপমান হবে। তাই পঞ্চানন মল্লিক বলেন—

"তিস্তাবুড়ি আমাদের দেবতা হন। সেই তিস্তাবুড়িকে বন্ধা আমরা সহ্য করিব না। আর এক মাস পরে তিস্তা ব্যারেজের উদ্বোধনের দিন আমরা প্রতিবাদের মিছিল নিয়া ঐ তিস্তা ব্যারেজের কাছে যাইব। আপনারা সব জায়গা হইতে সেদিন মিছিল লইয়া তিস্তা ব্যারেজে যাইবেন।"[১৭]

'তিস্তাবুড়ি' উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের যেমন আরাধ্য দেবী তেমনি মুসলমান সমাজের মানুষেরাও এই দেবীকে যথারীতি শ্রদ্ধা করে। 'তিস্তাপুরাণ' উপন্যাসের দশনদী-বিশনদী আর ছয় হাটের পৃথিবীর পাইকার মৈজুদ্দিন তার মামলার কাজে দুপুরবেলায় জলপাইগুড়ি সদর কোর্টের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বেরোয়। পথে এক অপরিচিত নাইয়া বা মাঝির সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটলে সে তার নৌকায় উঠে। কিন্তু সেই মাঝি ছিল নতুন, নদীর রাস্তা তার ঠিকঠাক জানা ছিল না। তাই পাইকারের কথামত বড় নদীতে অর্থাৎ তিস্তায় যাবার জন্য নৌকাটি ঘাড়ে নিয়ে কিছু পথ তাদের পায়ে হেঁটে চলতে হয়। তিস্তার পাশাপাশি পৌঁছে গেলে মাঝিটি সেখান থেকেই তিস্তাবুড়িকে প্রণাম জানায় এবং তার সঙ্গে সঙ্গে পাইকারও যথা নিয়ম মত তিস্তাবুড়িকে প্রণাম জানায়। ঔপন্যাসিকের বর্ণনায়—

"সে দিকটা কোনাকুনিই দেখায় ও ঘাটোয়াল বুঝতে পেরে বলে দেয়, 'মা তিস্তাবুড়ি।' ঘাটোয়াল সেই একহাতই ছড়িয়ে দেয়, ঘাড় হেলিয়ে, কাঁধের সোলোংগার মাথাটাও একটু হেলিয়ে। পাইকার দুই হাত দুদিকে ছড়িয়ে কোমর ভেঙে সেলাম করে, তিস্তাবুড়িকে প্রণামের এটাই রীতি, হিন্দু-মুসলমান নিরপেক্ষ রীতি।"[১৮]

গারাম দেবতা:

বাংলার গ্রামাঞ্চলের প্রায় সব জায়গায় গ্রামের বাইরে থান বা স্থান নামে নির্দিষ্ট একটি জায়গা চিহ্নিত থাকে যেখানে প্রতিষ্ঠিত থাকে গ্রাম-দেবতা। এই থানগুলি কোথাও খোলা আকাশের নিচে বা গাছের ছায়ায় আবার কোথাও বা এগুলির উপরে সামান্য আচ্ছাদনও থাকে। তবে থান বা স্থানগুলিতে কোথাও মূর্তিরূপী দেবতা প্রতিষ্ঠিত থাকে আবার কোথাও থাকে না। মূর্তি থাকুক বা না থাকুক গ্রামবাসীরা নিজেদের মনোবাসনা পূরণ করতে থানগুলিতে পুজো দেয় এবং থানের দেবতাকে নানাভাবে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করে। থানের দেবতা অর্থাৎ গ্রাম-দেবতা সর্বত্র একই নামে বা রূপে পরিচিত নয়। অঞ্চলভেদে এর নাম আর গঠনের ভিন্নতা দেখা যায়।

দেবেশ রায়ের 'তিস্তাপুরাণ' উপন্যাসে আমরা 'গারাম' নামে এক গ্রাম দেবতার পরিচয় পাই। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে গারামের থান নামে বিভিন্ন দেবতার জন্য একটি দেবস্থান থাকে, এই থানের প্রধান দেবতা হলেন 'গারাম'। গারাম দেবতা সম্পর্কে গবেষক পবিত্র রায় বলেছেন—

"উত্তরবঙ্গের গারাম থানে দেখা যায় গারাম, সন্ন্যাসী, মহাকাল, তিস্তাবুড়ি, কালী, বিষহরী, শিব, পাগেলা পীর প্রভৃতি দেবদেবীর অবস্থান; তবে উত্তরবঙ্গে গারামের প্রধান দেবতা হলেন গারাম। গারামের থানে সাধারণত এক একজ দেব-দেবীর প্রতীক হিসেবে একটি করে পাথর বসানো থাকে। সবার মাঝখানে থাকে গারামের পাথর এবং সেটাই সব থেকে বড়ো মাপের হয়। অন্যান্য দেব-দেবীকে গারামের চতুর্দিকে স্থাপন করা হয়।"[১৯]

সাধারণত এই থানগুলি তৈরি হয় বাঁশ ঝাড়ের তলায়। লোকসমাজের বিশ্বাস গারামের থানে অবস্থিত দেব-দেবীগণ গ্রামের মানুষকে বিভিন্ন বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেন, আর সেজন্যই তারা সারা বছরই গারামের থানে নানা উদ্দেশ্যে পূজা দেয়। 'তিস্তাপুরাণ' উপন্যাসে বুড়িমার বাড়ির দুই তরুণ খঞ্জন ও ফড়িঙ্গা গ্রামের বাইরে যাত্রার পূর্বে তাদের জেঠাদাদা এদের সঙ্গে নিয়ে যাত্রা সফল করার কামনায় গারামের থানে সেলাম জানাতে যায়। ঔপন্যাসিকের বর্ণনায়—

> *"ওরা গ্রামপ্রান্তে এসে পড়েছিল।...একটা আলগা বাঁশঝাড়ের তলায় একটা এক-দেড়হাত দোচালা ভেঙে পড়ে আছে। তার নীচে একটা পাটকাঠির দেবতা আছে বলে ধরে নেওয়া হয়। এটা গারাম-এর ঘর। এই বাঁশঝাড় গারাম-এর বাঁশঝাড়। ঐ ঝাড়ের বাঁশ কেউ কখনো কাটে না।...ওরা তিনজনই গারামকে সেলাম করে—দুই হাত দুদিকে ছড়িয়ে কোমর থেকে মাথা সামনে ঝুঁকিয়ে। গারামকে প্রণাম করা হয় না, সেলাম করা হয়।"*[২০]

লৌকিক ব্রত: ষাইটোল ব্রত

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের একটি অন্যতম ব্রত হল 'ষাইটোল ব্রত'। সাধারণত সন্তান কামনায় এবং সন্তানের মঙ্গলার্থে এই ব্রত পালিত হয়। অনেকে মনে করেন ষাইটোল শব্দটি 'ষষ্টি' শব্দ থেকে এসেছে। আর ষষ্ঠী দেবীই হল ষাইটোল দেবী। কেননা, ষাইটোলের বহু গানে তার প্রমাণ পাওয়া যায়—

"ষষ্ঠী মায়ের জন্ম হইল নন্দী গোয়ালের ঘরে
কি ষষ্ঠী মা মন দিয়ে ঘোরে।
আইসো আইসো ষষ্ঠী মা রথতে চড়িয়া
কি ষষ্ঠী মা মন দিয়ে ঘোরে।
আইসো আইসো ষষ্ঠী মা হস্তীতে চড়িয়া"[২১]

ষাইটোল দেবীর মূর্তি শোলা দিয়ে তৈরি হয়। ষাইটোল পূজার অপরিহার্য অংশ হল গান ও নাচ। এই পূজার আবশ্যিক বাদ্যযন্ত্র হল ঢোল। এছাড়াও দোতারা, বাঁশি, কাঁসর প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। ষাইটোল ব্রতের ধারা ভাষ্যে উঠে

আসে বন্ধ্যা নারীর সন্তান লাভ সহ সন্তানকে ঘিরে নানান সাংসারিক আকাঙ্ক্ষা। 'তিস্তাপুরাণ' উপন্যাসে আমরা ষাইটোল ব্রতের কথা পাই। এ প্রসঙ্গে 'তিস্তাপুরাণ' উপন্যাসে 'ষাইটোল' বানানের পরিবর্তে ঔপন্যাসিক 'সাইটোন' বানানটি ব্যবহার করেছেন। বানানের দিক থেকে এই ভিন্নতা থাকলেও মিথ কথার দিক থেকে কোনো পার্থক্য নেই। ঔপন্যাসিক যেটির উল্লেখ করেছেন বুড়িমার কিংবদন্তির প্রসঙ্গে।

> *"সাইটোন ছিল জন্মবাঁজা। তার শাশুড়ী তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে বলেছে—'বানজি-ন্যাড়ের বেটী রে।' তার শ্বশুর তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে বলেছে—'তোক বানজিক দেইককো বনবাসে রে।' তার স্বামী তাকে বনবাসে দিয়ে এসে বলেছে—'আজি বানজি-বংশক দিনু বনবাসে রে।' সেই জন্মবাঁজা সাইটোনদেবীকে ঠাকুরানী বর দেয় নি—'মুই না হওঁ তোর বরের অধিকারো রে।' সেই জন্মবাঁজা সাইটোনদেবীকে চণ্ডীমা বর দেয় নি—'মুই না হওঁ তোর বরের অধিকারো রে।' শেষ পর্যন্ত মা-মনসার বর জোগাড় করে সাইটোনদেবী স্বামীর ঘরে ফিরে এসে স্বামীকে নিয়ে গোহালিয়ায় গর্ভ করিয়ে একখান গোত, একখান মহাগোত তুলেছিল। বুড়িমাকে তো আর তেমন করতে হয় নি। বুড়িমাকে তো আর বাঁজা বলে বনবাসে দেয় নি। বাঁজা না-হওয়ার অমিলটা চোখে পড়ে আর বুড়িমা যে সাইটোনদেবীর মত একটা গোটা গোত, একখান মহাগোত বানাল সেই মিলটা চোখে পড়ে না?"*[২২]

গরুচুমানি ব্রত:

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের একটি জনপ্রিয় উৎসব হল 'গরুচুমানি ব্রত'। কার্তিক সংক্রান্তিতে এই ব্রত পালিত হয়। গরুচুমানি ব্রতের দিন সকালে গরুকে স্নান করিয়ে গরুর শিঙে, কপালে ও ক্ষুরে কাঁচা হলুদ, তেল, সিঁদুর লাগিয়ে বরণ করা হয়। এই সময় বিশেষভাবে থালা সাজান থাকে। থালাতে থাকে পান, সুপারি, কাঁচা হলুদ বাটা, তেল, সিঁদুর, ধান-দূর্বা ইত্যাদি। ব্রতের শুরুতে বাড়ির সবচেয়ে বৃদ্ধ মহিলা সবচেয়ে বৃদ্ধ গাই বা বলদকে এবং সবচেয়ে ছোট রাখালকে বরণ করে। এরপর বাড়ির সবচেয়ে নতুন বউ সবচেয়ে নতুন গাই বা বলদকে এবং

বাড়ির সবচেয়ে প্রবীণ রাখালকে বরণ করে। এই ব্রত সম্পর্কে ড: নির্মেলেন্দু ভৌমিক বলেছেন—

> *"এই দিন সকাল বেলা গরুকে স্নান করাইয়া তাহার মাথায় তেল সিঁদুর ধান-দূর্বা ইত্যাদি দেওয়া হয়। সন্ধ্যা বেলাতেও গোয়াল ঘরের সম্মুখে গরুকে তেল সিঁদুর দেওয়া হয়। এই দিন যে রাখাল গরুকে চরায়, তাহাকে নতুন জামা-কাপড় ও মিষ্টান্ন দেবার রীতি আছে।"*[২৩]

'তিস্তাপুরাণ' উপন্যাসে আমরা দেখি, কার্তিক সংক্রান্তিতে বুড়িমার বাড়িতে গরুচুমানি ব্রত পালন করার জন্য বাড়ির সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ব্রতের দিন সকালে বড়চিলা, ছোটদাদা, কলিন, বনুয়া ও আরসব পুরুষ মিলে বাড়ির ছোট-বড় সব গরুকে ডোবায় নামিয়ে স্নান করায়। অন্যদিকে বাড়ির মহিলারা স্নান সেরে গরুগুলিকে বরণ করার জন্য প্রস্তুত হয়। দু-একজন মাটির থালায় পান, সুপারি, কাঁচা হলুদবাটা, তেল সিঁদুর, ধান-দূর্বা নিয়ে গরুগুলির সামনে এসে দাঁড়ায়। এর মধ্যে কেউ কেউ চেঁচাতে থাকে বুড়িমাকে আনার জন্য। কেননা বুড়িমা ছাড়া তো এই অনুষ্ঠান শুরু হতে পারে না, বুড়িমাই তো এই গোতের সবচেয়ে প্রবীণ মহিলা। *"একদিকে কলিন, আর-একদিকে ছোটদাদা, মাঝখানে বুড়িমা-কোলে ঝারী-কেউ তেমন পথ আটকে ছিল না, তবু সবাই দু-একপা পিছিয়ে পথ করে দেয়। কলিন আর ছোটদাদা তো সরে যেতেই পারত। তারা সরে না—আজকের এই গরুচুমানি ব্রতের প্রধান প্রতিমা নিয়ে তারা যেন মন্দিরে ঢুকছে।"*[২৪] বুড়িমাকে কোলে নিয়েই ঝারী বাড়ির সবচেয়ে বৃদ্ধ গাইয়ের সামনে গিয়ে বসে। *"ধোলী বুড়িমার হাতটা টেনে থালার সিঁদুর আর হলুদের ওপর রাখে। ছোটদাদা বুড়িগাইয়ের মাথাটা নীচে থেকে টেনে এই এতগুলো বসামাথার মাঝখানে নিয়ে আসে।"*[২৫] এভাবে বাড়ির সবচেয়ে বৃদ্ধ গরুকে বরণ করার পর, বুড়িমার হাত দিয়ে বাড়ির সবচেয়ে নবীন বালককে বরণ করানো হয়। *"কালেশ্বরী ভোটুকে কোলে নিয়ে ঝারীর ওপর ঝুঁকে পড়ে। ধোলী বুড়িমার হাত ভোটুর গায়ে ছুঁইয়ে বুড়িমার কোলের ওপর গুছিয়ে রাখে।"*[২৬]

বুড়িমার বাড়ির সবচেয়ে নবীন বউ মননী। তাই মননী সবচেয়ে নতুন বাছুর আর সবচেয়ে বৃদ্ধ রাখালকে বরণ করে। *"পাথারনী, এ-বাড়ির সবচেয়ে নতুন বৌ মননীকে নিয়ে নতুন বাছুরের কাছে যায়।...মননীকে পাথারনী বলে, 'কপালত লেপিদে। নাকত দে। পাওয়ত দে।'...পাথারনী তখন তাকে আমাসু, আর নকরুর বাপোর বাপোর কাছে, নিয়ে যায়। মননী তাদের দুজনের কপালে হলুদ আর সিঁদুর লাগিয়ে দেয়।"*[২৭] মননী আর বুড়িমার কাজ শেষ হলে বাড়ির সকল মহিলা একসঙ্গে উলু দিয়ে বাকি গরুগুলির শিঙে তেল-সিঁদুর, তেল-হলুদ লেপে দেয়। এরপর বাড়ির বধূরা নিজেদের স্বামীকে রাখাল হিসাবে বরণ করে। *"গোরুচুমানি ব্রত মানে রাখোয়ালচুমানি ব্রত। এই ব্রত- অনুযায়ী যে-যার স্বামীকে রাখাল হিশেবে ঐ সব মাখিয়ে রাখোয়ালচুমানি করে। বুড়িমার বাড়িতে সেটা সত্যও বটে। কারণ, এ-বাড়িতে তো আলাদা রাখোয়াল নেই। বাড়ির ছেলে বুড়ো সকলেই রাখোয়াল।"*[২৮] এবং সেই সঙ্গে তারা রাখোয়ালচুমানির গানও গায়—

"ঐ রাখোলিয়া মোর কপালে নাই,
আইসেক সোয়ামি, তোঁহক চুমাই।"[২৯]

অর্থাৎ রাখাল রাখার ক্ষমতা নেই বলেই গৃহবধূ বাধ্য হয়ে তার স্বামীকেই রাখাল হিসাবে চুমানি করে। গানের এই অংশটুকু করুণ সুরে গাইতে গাইতে বুড়িমার বাড়ির মহিলারা তাদের স্বামীদের কপালে সিঁদুর-হলুদ লেপে দেয়। আর অনেকে গান ছাড়াই এই শুভ কাজটি সম্পন্ন করে। *"শাদুরী এসে ধানরামের কপালে সিঁদুর-হলুদ লেপে দিতে-দিতে গানে যোগ করে দেয়, 'মোর সোয়ামির দুইখান শিঙ বানাই দে—এ'। টুলটুলী গিয়ে দুখারুর কপালে কোনো গান ছাড়াই সিঁদুর-হলুদ লেপে দেয়, যেন হালুয়া-রাখালিয়াকে তার সারা জীবনের শ্রমের জন্যে নমস্কারই জানায় তার সারা জীবনেরই শ্রমসঙ্গিনী।"*[৩০] গরুচুমানি ও রাখোয়ালচুমানি হয়ে গেলে গরুকে বিশেষ ধরনের খাবার খাওয়ানো হয়। পাকা লাউ, নতুন কাটা ঘাস, পেঁয়াজ ইত্যাদি নতুন চাড়িতে দিয়ে জল আর নুনে মিশিয়ে খেতে দেওয়া হয়। বুড়িমার বাড়িতে গরুর সংখ্যা বেশি থাকায় তারা প্রত্যেক গরুকে আলাদা আলাদা চাড়িতে খাওয়াতে পারে না। এক একটা চাড়িতে তারা তিন চারটা গরুকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করে।

"ছোটদাদা তখন এক-এক চাড়িতে জল-নুন-ঘাস-জাব মেশাচ্ছে। কলকলীকে দেখে বলে, 'পেঁয়াজ নি আসো আর লাউখান কাটি দ্যাও।'...কলকলীর হাতের কাঁচিদাওয়ের এক-এক টানে এক-একটা টুকরো মাটিতে পড়ছিল। ছোটদাদা সেগুলো দুহাতে তুলে নিয়ে সবগুলো চাড়িতে কিছু-কিছু ছড়িয়ে দেয়। ছোট-আষাঢু দুই হাতে আরো চারটে লাউ এনে ফেলে আবার লাউ কাটতে ছুটে যায়। একটা বাঁশের ঝুড়িতে পেঁয়াজ নিয়ে আসে শাদুরী। সে নিজেই চাড়িগুলোতে পেঁয়াজ ফেলে দেয় মুঠো-মুঠো।"[৩১] সমস্ত কাজ শেষ হলে ব্রতের রীতি মত বুড়িমার বাড়ির সমস্ত পুরুষেরা শিকারের জন্য জঙ্গলের অভিমুখে রওনা হয়। *"প্রতি বছরই এই অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেলে ছেলেরা কিছু-একটা শিকারে ফরেস্টে ঢোকে। কিছু নিয়েই ফেরে—খরগোশ, গোসাপ, কখনো-কখনো বড় মাছ নিয়েও আসে।"*[৩২]

গরুকে নিয়ে এধরনের ব্রতানুষ্ঠান বাংলা তথা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত। রাজবংশীদের মধ্যে প্রচলিত এই গরুচুমানি ব্রতের সঙ্গে আমরা মিল খুঁজে পাই বাঁধনা পরব ও গোকুল ব্রতের। ভারতবর্ষে ঠিক কোন সময় থেকে গো-বন্দনা শুরু হয়েছে তার বিবরণ পাওয়া যায় না। বৈদিক আর্যভাষী মানুষজনের কাছে গরু ছিল পরম সম্পদ। তারা গরুকে দেখত কল্যাণকারী পশু হিসেবে। কিন্তু তারা গরুর উপর কোনোরূপ দেবত্ব আরোপ করেনি। তাদের কাছে গো-সম্পদ ছিল একান্তভাবে পার্থিব সম্পদ। বৃষ ছিল বল, বীর্য ও প্রজননের প্রতীক আর গাভী ছিল কল্যাণকারী শুভ শক্তির প্রতীক। গরুকে প্রথম দেবতা রূপে বন্দনা করা হয়েছিল পৌরাণিক যুগে। মহাভারতে স্পষ্টভাবে গো-জাতিকে পূজার নির্দেশ দেওয়া আছে—সকাল সন্ধ্যায় গো-জাতিকে প্রণাম করতে হবে, গোমূত্র ও গোময় দর্শন করতে হবে। সেই সঙ্গে গোময়কে লক্ষ্মীদেবীর বাস বলা হয়েছে। কৃষি জমি উর্বর করার জন্য গরুর মল-মূত্র খুবই প্রয়োজনীয়। জমি চাষের জন্য বৃষ হলো পরমবন্ধু এবং দুধ দানের জন্য গাভী হলো মাতৃতুল্য। গাভীই লক্ষ্মী, গাভীই ভগবতী। এইভাবে প্রাচীন ভারতবর্ষের পৌরাণিক যুগে গো-বন্দনা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রাচীন ভারতীয় হিন্দু সমাজে কৃষি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে গো-বন্দনারও বিস্তার হতে থাকে। এরসঙ্গে পৌরাণিক কৃষ্ণ-কাহিনি যুক্ত হওয়ায় গো-ধন সম্পর্কিত ধারণা সমগ্র

ভারতবর্ষে এমন কি, গোমাংস ভোজী অনার্যভাষী মানুষদের মধ্যেও প্রভাব বিস্তার করে।[৩৩] গো সম্পর্কিত এই প্রবহমান বিশ্বাসই আজকের দিনের গরুচুমানি ব্রত, বাঁধনা পরব ইত্যাদি গো-বন্দনায় পরিণত হয়েছে।

লোকবিশ্বাস ও সংস্কার: জাদু

বিভিন্ন লোকবিশ্বাসগুলি (folk belief) উত্তরবঙ্গের লোকসমাজের অন্তরে কীভাবে গাথা আছে, যুগ যুগ ধরে অশিক্ষা ও কুসংস্কারে বাস করে উত্তরবঙ্গের লোকসমাজ কীভাবে তাদের বিশ্বাসের জগতকে গড়ে তুলেছে তার বহু উদাহরণ রয়েছে দেবেশ রায়ের উপন্যাসে। ব্রিটিশ বিবর্তনবাদী নৃতাত্ত্বিক J.G.Frazer (জেমস্ জর্জ ফ্রেজার) তাঁর বিখ্যাত বই 'The Golden Bough' গ্রন্থে জানিয়েছেন, মানব সভ্যতা তিনটি স্তর অতিক্রম করে এগিয়ে চলেছে। প্রথম স্তর জাদু (Magic), দ্বিতীয় স্তর ধর্ম (Religion), তৃতীয় স্তর বিজ্ঞান (Science)। ফ্রেজারের মতে, যেসব মানুষ বিজ্ঞান জানত না সেই সময় প্রকৃতির কারণগুলি সম্পর্কে মানুষের ধারণা ছিল ভ্রান্ত। এই ভ্রান্ত ধারণা হল আদিম মানুষের জাদুবোধের ভিত। *"In short, magic is a spurious of natural law as well as fallacious guide of conduct ; it is a false science as well as an abortive art."*[৩৪] ফ্রেজার জাদুর দুটি মূল সূত্রের উল্লেখ করেছেন- সাদৃশ্য সূত্র (Low of Similarity) ও সম্পর্ক সূত্র (Low of Contact)। আবার ভাবের দিক থেকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন- শুভকারী জাদু (White Magic) ও অশুভকারী জাদু (Black Magic)।

জাদুর নেতিবাচক প্রয়োগকে বলা হয় কালো জাদু (Black Magic)। শত্রুর ক্ষতি হোক এবং নিজের মঙ্গল হোক এই চিন্তা থেকেই অশুভাকারী জাদুর উৎপত্তি। যারা এই জাদুর প্রয়োগ করে তাদের ডাইনি, পিশাচ, রাক্ষস ইত্যাদি বলা হয়। তুক-তাক, মন্ত্র-তন্ত্র, ঝাড়-ফুঁক ইত্যাদির সাহায্যে শত্রুর ক্ষতি করাই এই জাদুর মূল লক্ষ। এই কালো জাদুর বিশ্বাসের ফলেই গ্রামাঞ্চলে দেখা যায় মেয়েরা চুল আঁচড়ানোর পর, যেসমস্ত চুল চিরুণিতে লেগে থাকে সেগুলিকে একসঙ্গে করে

তিনবার থুথু দিয়ে ফেলে দেয়। লোকসমাজের বিশ্বাস থুথু দিয়ে ফেললে ওই চুল দিয়ে কালো জাদুর প্রয়োগ আর সম্ভব নয়। কোনো শিশুকে বাইরে কোথাও নিয়ে যেতে হলে তার কপালে কালো টিপ দেওয়া হয় কালো জাদু, বদ-নজর, বদ-হাওয়া ইত্যাদি অশুভকারী শক্তির হাত থেকে বাঁচাতে। গ্রাম-গঞ্জে মেটে বাড়ির দেওয়ালে নানা ধরনের চিত্র আঁকা থাকে, ঘরের দেওয়ালে লংকা, লেবু ঝোলানো থাকে। শস্য ক্ষেতে লক্ষ করলে দেখা যায় লাঠির মাথায় ভাঙা হাড়ি, ছেঁড়া জুতো, ঝাড়ু ইত্যাদি ঝুলে আছে, যাতে অলৌকিক জাদুশক্তি বা কালো জাদু এইসমস্ত কিছুতে ধাক্কা খেয়ে প্রতিহত হয়। কালো জাদুর বিশ্বাস বা ভীতি থেকে সৃষ্ট এই ধরনের অনেক আচরণ লোকসমাজে এখনও প্রচলিত।

দেবেশ রায়ের উপন্যাসে আমরা কালো ও সাদা এই দুই ধরনের জাদুর সঙ্গে পরিচিত হই। উত্তরবঙ্গ কৃষিপ্রধান অঞ্চল। কৃষিকাজই বেশির ভাগ মানুষের প্রধান অবলম্বন। আর এখানকার মানুষের প্রধান ফসল হল ধান। ধানের ফলনের উপর নির্ভর করে সারা বছর কেমন কাটবে। সেজন্যই তারা চায় না কোনোভাবে এই ফসলের ক্ষতি হোক। হাতি, হরিণ, গণ্ডার ইত্যাদি বন্য জীবজন্তু ক্ষেতের ধান নষ্ট করলে সকলে মিলে তাড়িয়ে দেয়। কিন্তু কোনো অপশক্তি বা কালো জাদুকে তো আর দেখা যায় না, তাই এই সমস্ত শক্তির হাত থেকে বাঁচতে তারা নজরকাঁটা লাগিয়ে রাখে। ঔপন্যাসিক 'মফস্বলি বৃত্তান্ত' উপন্যাসে এরকমই একটি বর্ণনা দিয়েছেন—

> *"কার্তিক মাসের পাকাধানের খেত কোনো মানুষ নেই, দিগন্ত পর্যন্ত পাকাধানের খেত, স্থির, প্রায় অনড়, যেন কঠিনই, মাঝেমাঝে লাঠির আগায় হাঁড়িকালো নজরকাঁটা।"*[৩৫]

'তিস্তাপুরাণ' উপন্যাসে দেখি বুড়িমার বাড়ির এক কিশোর বনুয়াকে অপশক্তির হাত থেকে বাঁচাতে তার কোমরে কালো সুতো দিয়ে তাবিজ বেঁধে দেওয়া হয়েছে। *"সেই বানভাসা বা বনুয়া মাটিতে খাড়া হয়ে দাঁড়ালে তার কোমরের কাল সুতো তাবিজের ভারে তলপেটের নীচে নেমে যায় আর পেছনের সুতো যাবে কোমরের*

ওপরে।"[৩৬] উপন্যাসে আরো দেখা যায়, আচমকা কারো কোনো রোগ হলে মনে করা হয় বাণ মারা হয়েছে বা কোনো অপদেবতা ভর করেছে। ঔপন্যাসিক ভুঁইচালীর জন্মের কথা বলতে গিয়ে এর বর্ণনা দিয়েছেন—

> *"ভুঁইচালী যখন বেশ ভরে উঠেছে তার মায়ের পেটে তখন একদিন তার মায়ের রক্তস্রাব শুরু হয়ে যায়। এগুলো তো বাণমারার ঘটনাই সাধারণত হয়ে থাকে। আর এক কারণ হতে পারে, কোনো গাছটাছ থেকে কোনো অপদেবতা তার ওপর ভর করেছে।"*[৩৭]

মৃতদেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নিয়ে লোকসমাজের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের বিশ্বাস ও সংস্কার রয়েছে। 'তিস্তাপুরাণ' উপন্যাসে বুড়িমার বাড়ির ঢেমনা অর্থাৎ ছোটদাদার বাবার তামাক-ক্ষেতে মৃত্যু হলে বঙ্কুরাম, বড়দাদা, বড়বেটা- খেতুয়া, ভাদই, বনুয়া, বড়চিলা, অষাঢু, ভাসা এরা সকলে মিলে মৃতদেহটি নিয়ে এসে লোকাচার অনুসারে ঠাকুর ঘরের সামনে রাখে। লেখকের বর্ণনায়—

> *"বাড়ির-এগিনায় ঠাকুরানীর ঘরের সামনে একটুখানি জায়গা গোবরলেপা হয়েছে —একটা মানুষকে শোয়াতে যতটুকু জায়গা লাগে সেই মাপটাই একটু এদিক-ওদিক হয়ে আছে।"*[৩৮]

লোকবিশ্বাস অনুসারে মৃতদেহ কখনো একা ফেলে যেতে নেই। তাই দেখা যায় নির্দিষ্ট জায়গায় মৃতদেহটি রাখার পর সকলে সরে গেলেও বড়চিলা আর ভাদই সেখানেই থেকে যায়। *"শববাহকেরা সেখানে মাচানটা মাটির ওপর নামিয়ে দেয়। বড়চিলা আর ভাদই মাচানের পাশেই দাঁড়িয়ে থাকে। বাকি সবাই একটু আধটু সরে।"*[৩৯] এরপর ঢেমনার মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে আগুন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। সৎকারের রীতি অনুসারে মৃতদেহ চিতায় স্থাপন করার পর মৃতের পুত্র বা পুত্রস্থানীয় কেউ চিতার চারদিকে সাতবার ঘুরে চিতায় আগুন দেয়। চিতায় প্রথম আগুন দেওয়ার এই রীতিকে বলা হয় মুখাগ্নি। ঢেমনার ছেলে ছোটদাদা অনুপস্থিত থাকায় সৎছেলে বড়দাদাকে মুখাগ্নি করে। *"মৃতদেহ তোলার আগে বিসারু বড়দাদাকে*

ডেকে বলে, 'ছোটদাদা থাকিলে ছোটদাদা করিত। ছোটদাদা নাই অ্যালায় তোঁহোক মুখাগ্নি করিবার লাগে।'[৪০]

নামকরণ:

বাংলার সমাজ জীবনে নামকরণ একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সমাজে নামকরণের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয় বার-তারিখ-তিথি-গোত্র ইত্যাদির। তবে শিশু বেড়ে ওঠার সাথে সাথে তার স্বভাব, গায়ের রঙ ও গঠন ইত্যাদির উপর নির্ভর করে আরো নতুন নাম তৈরি হয়। যাকে বলা হয় ডাকনাম। নাগরিক সমাজজীবনে শিশুর নামকরণের সময় ব্যাকরণগত অর্থের দিকে তাকিয়ে নাম রাখা হয়, কিন্তু লোকসমাজে নামকরণের ক্ষেত্রে ব্যাকরণগত কোনো ভাবনা চিন্তা থাকে না। 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' উপন্যাসে বাঘারুর সঙ্গে এম.এল.এ বীরেন্দ্রমোহন রায়বর্মনের কথপোকথনের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে লোকসমাজে নাম কিভাবে তৈরি হয়। এম.এল.এ বীরেন্দ্রমোহন রায়বর্মন বাঘারুর সঙ্গে পথ চলতে চলতে কৌতূহল বশত বাঘারুর নাম জিজ্ঞেস করলে সে জানায়—

> *" 'ঐখান ত বড় লজ্জার কথা বাবু।*
>
> *'কোনখান?'*
>
> *'ঐ। মোর নামখান।'*
>
> *'ধুত, নামেতে আর লজ্জা কী আছে? নাম ত নামই।'*
>
> *'মোর নামখান বাড়ি যাছে।'*
>
> *'কায় বাড়ি যাছে?'*
>
> *'যত টাইম যাছে, মোর নামখান সলসল করি বড় হয়্যা যাছে। এ্যালায় এ্যাতখান বাড়ি গেইছে যে ঐ নামখানে মুই আর আঁটো না। ঢলঢলাছে।' "*[৪১]

বাঘারু তার নামের বৃত্তান্ত জানাতে গিয়ে এম.এল.এ-কে জানায় সে যখন মায়ের পেটে ছিল তখন তার নাম ছিল 'কুড়ানিয়ার ছোয়া'। কারণ তার মা গয়ানাথের বাড়ির কাজ করত। কাজ হিসাবে ছিল ফরেস্টের ভিতর থেকে শুকনো কাঠ, ডালপালা কুড়িয়ে আনা। আর জন্মের পর তার নাড়ি কুঠার দিয়ে কাটা হয়েছিল

বলে তার নাম হয় 'কুড়ালিয়া-কাটা'। তবে গয়ানাথ জোতদার ভোটের খাতায় তার নাম নথিভুক্ত করে 'ফরেস্টচন্দ্র বর্মন' বলে। আসলে ফরেস্টের সঙ্গে বাঘারুর একটা গভীর সম্পর্ক রয়েছে, সে সারাদিন গয়ানাথের গরু, মোষগুলিকে ফরেস্টে চরিয়ে বেড়ায় এবং তার মাও তো সারাদিন ফরেস্টে কাটাত, সে জন্য হয়তো গয়ানাথ তার নাম দেয় ফরেস্টচন্দ্র বর্মন। আর বাঘের সঙ্গে লড়াই করে বাঘকে হারিয়ে ছিল বলে তার নাম হয়ে যায় বাঘারু। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাঘারু তার নিজের নাম নিজেই ঠিক করে 'ফরেস্টারচন্দ্র বাঘারুবর্মন'। তার এই নামের যৌক্তিকতা সম্পর্কে বাঘারু জানায়—

> *"মুই ত সবখান নামই রাখি দিছু—ফরেস্টারচন্দ্র বাঘারুবর্মন। বর্মন এইঠে অনেক মিলিবে, ফরেস্টচন্দ্রও অনেক পাবেন, বায়-বর্মনও আছে, কিন্তু বাঘারু-বর্মন এই একোখান।"*[৪২]

'তিস্তাপুরাণ' উপন্যাসে এরকমই একাধিক নামের সঙ্গে আমরা পরিচিত হই—

বৈশাখু— বৈশাখ মাসে যে জন্মেছে।

আষাঢু— আষাঢ় মাসে যে জন্মেছে।

চৈতা— চৈত্র মাসে জন্মেছে বলে।

আগী— অগ্রহায়ণ মাসে জন্মেছে বলে।

বুধুনী— বুধবারে যে জন্মেছে।

দেবারু— রবিবারে জন্মেছে বলে নাম দেবারু।

আনধারী— খুব ঝড়-বৃষ্টির রাতে জন্মেছে বলে নাম আনধারী।

পোহাতি— যে খুব সকালে জন্মেছে তার নাম পোহাতি।

বাসিয়া— জন্মের অনেকক্ষণ পর প্রথম পেচ্ছাব করেছে বলে নাম বাসিয়া।

ক্ষেতুয়া— ক্ষেতে জন্ম হয়েছে বলে নাম ক্ষেতুয়া।

ভোটু— ভোটের সময় জন্ম হয়েছে বলে।

বানুয়া— বন্যার সময় জন্ম হয়েছে বলে নাম বানুয়া।

লেভী— লেভির সময় যে জন্মেছে তার নাম লেভী।

ধোলী— গায়ের রঙ ফর্সা বলে নাম ধোলী।

কাল্টী— গায়ের রঙ কালো বলে নাম কাল্টী।

জোনাকু— জ্যোৎস্না রাতে জন্ম বলে নাম জোনাকু।

লোকসাহিত্য: প্রবাদ

বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির একটি অন্যতম ধারা হল প্রবাদ। প্রবাদ হল গোষ্ঠীজীবনের অভিজ্ঞতার ফল। সমাজের বিভিন্ন সামাজিক অভিজ্ঞতা থেকে প্রবাদের অভ্যন্তরীণ কাঠামো তৈরি হয়। প্রকৃতপক্ষে সমাজে যা ঘটে এবং সামাজিক মানুষ প্রতিদিনের জীবনযাত্রা থেকে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তাই প্রবাদে প্রতিফলিত হয়। আশুতোষ ভট্টাচার্য 'বাংলার লোকসাহিত্য' গ্রন্থে প্রবাদের সংজ্ঞায় বলেছেন—

> *"প্রকৃতপক্ষে সমাজ যাহা আচরণ করে এবং সামাজিক মানুষ প্রাত্যহিক জীবনাচরণের ভিতর দিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করে তাহাদের মধ্যে যাহা নিজেদের অভিজ্ঞতার দিক দিয়া নিতান্ত তিক্ত, প্রধানতঃ তাহা দ্বারাই প্রবাদ রচিত হইয়া থাকে। প্রবাদ মধুর বচন নহে, তাহা সংসার সংগ্রামের ক্ষত বিক্ষত মানুষের কঠোর অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তি মাত্র।"*[৪৩]

তবে প্রবাদের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞাটি দিয়েছেন W.C.Hazlitt—

> *"An expression or combination of worlds conveying a truth to the mind by a figure, periphrasis, antithesis or hyperbole."*[৪৪]

স্বাভাবিকভাবেই প্রবাদের মধ্যে ধরা পড়ে জাতির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নানা উপাদান।

ঔপন্যাসিক দেবেশ রায়ের 'মফস্বলি বৃত্তান্ত' ও 'তিস্তাপুরাণ' এই দুই উপন্যাসে রয়েছে অনেকগুলি প্রবাদের ব্যবহার। যেগুলিতে উঠে এসেছে সমকালীন সমাজ-সংস্কৃতি, রাজনীতি ও অর্থনীতির নানা পরিচয়। উত্তরবঙ্গের কৃষিকেন্দ্রিক অর্থনীতির

একটি প্রধান ফসল হল ধান। ফলে ধান সম্পর্কে তৈরি হয়েছে প্রচুর অভিজ্ঞতা, যার প্রতিফল ঘটে এই প্রবাদে—

"শিষ দেখিলে বিশ দিন, কাটে মারে দশ দিন।"[৪৫]

দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে তাদের জানা হয়ে গেছে ধানের শিষ বেরোনোর কুড়ি দিন পর ধান পেকে যায়। তার পরের দশ দিনের ভেতর ঝাড়াই- মাড়াই শেষ হয়ে যায়। ধানকাটার উপযুক্ত সময় নিয়েও উত্তরবঙ্গে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে—

"অঘনে পেটি, পুষে চেউটি, মাঘে নারা, ফাগুনে কাড়া"[৪৬]

অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসে ধান কাটলে ষোল আনা ধান পাওয়া যায়। পৌষ মাসে ধান কাটলে কিছু কম হলেও বারো আনা পাওয়া যায়। মাঘ মাসে ধান কাটলে ধানের চেয়ে খড়ের পরিমাণ বেশি হবে এবং চার আনা ধান পাওয়া যায়। ফাল্গুন মাসে ধান কাটলে ধান আর পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় শুধু খড়।

লোকায়ত জীবনযাত্রায় একসময় হাটের স্থান ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা সেই সময়ে গ্রামের মানুষের কাছে ছিল না টেলিভিশন, রেডিও, সংবাদপত্র। তাদের হাট বাজারে গিয়েই নানা ধরনের খবর সংগ্রহ করতে হত। আর যে যত বেশি হাটে যেত তার সংগ্রহে থাকত তত নতুন নতুন খবর, ফলে দেশ ও সমসাময়িক পরিস্থিতি নিয়ে তার অভিজ্ঞতা বেড়ে যেত। ঔপন্যাসিকের ভাষায়—*"হাটই হচ্ছে চ্যাংড়াদের বড় হওয়ার, শেয়ানা হওয়ার, জোয়ান হওয়ার প্রতিষ্ঠান।"*[৪৭]

তাই কোনো অনভিজ্ঞ ব্যক্তি যদি কোনো বিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে নিজের অভিজ্ঞতার বড়াই করে তখন এই প্রবাদটি বলা হয়—

"কয়-হাটের ছোয়াই, বাপক ডাকে বিয়াই।"[৪৮]

মানব জীবনে কাঙ্ক্ষিত কোনোকিছু হাতের কাছে ধরা দিলেও যদি তাকে ধরা না যায় তাহলে সেই অধরা জিনিস খুবই মূল্যবান মনে করা হয়। এই অভিজ্ঞতা থেকে সৃষ্ট একটি প্রবাদ—

"যে-হাটে না যাই, সে-হাটের শেষ নাই।"[৪৯]

নারী হল গৃহলক্ষ্মী। বাড়িই তার যথার্থ স্থান। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার এই মানসিকতাজাত একটি প্রবাদ—

"জাই গেল ক্ষেতবাড়ি, মধ্যে হইল পথ
জাই গেলেন গিরির বৌ, নিত্য যাছে হাটত্।"[৫০]

অর্থাৎ ক্ষেত-জমির মধ্যদিয়ে মানুষের যাতায়াতের পথ তৈরি হলে যেমন ফসলের ক্ষতি হয়। তেমনি সংসারের ক্ষতি হয় বাড়ির বউ যদি প্রতিনিয়ত বাড়ির বাইরে যাতায়াত করে।

অনেকগুলোর মধ্যে মানুষকে যখন নির্দিষ্ট একটি নির্বাচন করতে বলা হয় তখন মানুষ অনেক সময় দিশেহারা হয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে না। এই অভিজ্ঞতা থেকে তৈরি একটি প্রবাদ—

"দিনের আলোয় বিলাই কানা, জমির আইলে হালুয়া কানা।"[৫১]

'তিস্তাপুরাণ' উপন্যাসে আমারা দেখি, আধিয়ারি আইন পাশ হওয়ার পর দিনু মাস্টার তার আধিয়ারকে জমি দখল দেওয়ার জন্য জলঢাকা নদীর পাড়ে এনে তাকে জমি পছন্দ করতে বলে। কিন্তু আধিয়ার অনেক জমির মধ্যে তার জমি পছন্দ করে উঠতে পারে না। এ প্রসঙ্গেই প্রবাদটি উপন্যাসে উল্লিখিত হয়েছে।

মানুষের প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় কতই না গোপন ঘটনা থাকে সেগুলির সব কি বাইরে প্রকাশ করা যায়? কিন্তু তারমধ্যে এমন কিছু ঘটনা থাকে যেগুলি গোপন করার বহু চেষ্টা করলেও তা গোপন থাকে না, বাইরের মানুষ তা জেনেই যায়। 'তিস্তাপুরাণ' উপন্যাসে আমরা দেখি, ১৯৬৪-র খড়ার প্রকোপে পড়ে বুড়িমার বাড়ির কোনো বউ বাচ্চা নেয়নি। কিন্তু সেসময় বাড়ির এক প্রবীণ মহিলা অর্থাৎ সোমারীর বাপের মা গর্ভধারণ করে। এই গর্ভধারণ তার কাছে প্রচণ্ড লজ্জার হয়ে দাঁড়ায়। যার ফলে সে বাইরে কারো সামনে বেরোতো না। প্রসবও প্রায় লুকিয়ে

লুকিয়ে করেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাড়ির সকলের কাছে এই বিষয়টি অজ্ঞাত থাকে না। এ প্রসঙ্গে উল্লিখিত একটি প্রবাদ—

"ঘেগী না পারে ঘেগ ঢাকিবার, পেটিলী না পারে প্যাট ঢাকিবার।"[৫২]

আমরা প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় এমন অনেক মানুষ খুঁজে পাই যারা সামান্যে সন্তুষ্ট হয় না। কিন্তু সামান্য কিছু অর্জন করার জন্য যতটুকু পরিশ্রম করা দরকার তারা ততটুকু পরিশ্রমও করে না। তারা কেবল মুখেই বলে এই করবো সেই করবো, কিন্তু কাজের বেলায় কিছুই নেই! এমন সব মানুষকে কটাক্ষ করে রচিত একটি প্রবাদ—

"অতি-বিয়ান্তীর না-হয় বিয়া, অতি-ছোয়ান্তীর না-হয় ছোয়া।"[৫৩]

সঠিক সময়ে সঠিক কাজ এবং যথাস্থানে বস্তু রাখা দরকার তা না হলে মানব জীবনে নানা সমস্যা তৈরি হতে পারে। এই অভিজ্ঞতা থেকে রচিত একটি প্রবাদ—

"কুমড়ার চালত্ কুমড়া নাই, কুমড়া ফলিছেন গুয়াগাছের মাথাত্।"[৫৪]

ছড়া:

বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম শাখা হল ছড়া। ছড়া বলতে অবশ্য এখানে লৌকিক ছড়াকেই বোঝানো হচ্ছে। কারণ ছড়াকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে— লৌকিক ছড়া ও সাহিত্যিক ছড়া। লৌকিক ছড়া বলতে বোঝায় সেই সমস্ত ছড়াগুলিকে, যেগুলি সংহত সমাজের মুখে মুখে তৈরি হয়ে মুখে মুখেই প্রচার লাভ করে। তাই এই ছড়াগুলির সঙ্গে লোকসমাজের সম্পর্ক হল গভীর। লোকজীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতাগুলি ছড়ার মাধ্যমে সমবেতভাবে প্রকাশ পায় বলে লোকসাহিত্যের আলোচনায় ছড়া একটি বিশেষ জায়গা দখল করে রয়েছে। লৌকিক ছড়াগুলির ক্ষেত্রে আমরা রচয়িতার কোনো পরিচয় পাই না। কিন্তু সাহিত্যিক ছড়াগুলি রচয়িতার নামসহ লিখিতভাবে প্রকাশিত হয়। লৌকিক ছড়া যেহেতু সংহত সমাজের তৈরি তাই সেখানে খুঁজে পাওয়া যায় লোকজীবনের পালনীয় প্রথা, আচার-আচরণ, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, ন্যায়-নীতি, জীবিকা, সমাজব্যবস্থা ইত্যাদি।

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের বাড়ি তৈরির প্রচলিত রীতি অনুসারে বাড়ির পূর্ব দিকে থাকবে পুকুর, পশ্চিমে থাকবে বাঁশবাগান, উত্তর দিকে থাকবে সুপারি বাগান আর দক্ষিণ দিক থাকবে ফাঁকা। দেবেশ রায় তাঁর 'মফস্বলি বৃত্তান্ত' উপন্যাসে রাজবংশী সমাজের বাড়ি তৈরির এই প্রচলিত রীতি সম্পর্কিত একটি ছড়ার উল্লেখ করেছেন। রাজবংশী সমাজের বাড়ি তৈরির চিরকালীন ধারায়-

"পুবে হাঁস,
পশ্চিমে বাঁশ,
দক্ষিনে ধুয়া,
উত্তরে গুয়া ।"[৫৫]

লৌকিক ছড়ার একটি অন্যতম ধারা হল ঐন্দ্রজালিক ছড়া। বিভিন্ন বিষয়ের ঐন্দ্রজালিক ছড়াগুলিকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়— ক) সৃজনাত্মক, খ) প্রতিহতমূলক, ঘ) ধ্বংসাত্মক। দেবেশ রায় তাঁর 'তিস্তাপুরাণ' উপন্যাসে একটি ধ্বংসাত্মক ছড়ার উল্লেখ করেছেন। অন্যের ক্ষতি করার আকাঙ্ক্ষা থেকেই ধ্বংসাত্মক ছড়ার সৃষ্টি। উপন্যাসে আমরা দেখি ৭০-এর দশকে নতুন ভূমি সংস্কার আইন অনুযায়ী খাসজমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিলি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে, প্রায়ই আধিয়ার আর জমিদারের মধ্যে গণ্ডগোল হতে থাকে। আধিয়াররা জমিদারদের অবৈধ জমিতে নিজেদের অধিকার জানাতে শুরু করে। এরকমই এক জোতদার ধরণী জোতদারনীর জমি আধিয়ার দখল করতে আসলে সে তাকে প্রতিহত করতে একটি ছড়া কাটে, যেটি একটি ধংসাত্মক ছড়ার উদাহরণ।

"তোক ঝাঁকোত্ ধরিম, খোলাত্ ধুইম,
কাটারি দিয়া কাটিম, আগুনত ভাজিম,
দাঁতের সুখে চিবাইম, তোর হাড়গিলা খড়খড় করি ভাঙিম,
মোর গলা দিয়া তোক প্যাটত সিন্ধাইম,
প্যাটের অগুনত ধিক ধিক করি হজম করিম,
পুটক দিয়া ডাঙ্গাত ফেলাম গু

স্যালায় তুই মোক চিনিব রে মুই ক্যানং বৌ।
কাউয়ায় চিলায় ঠোঁটত্ করি খাইবে সেই গু।"[৫৬]

ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন, এই ছড়াটি আসলে মাছের উদ্দেশ্যে তৈরি যেখানে একটি মাছকে ডেকে বলা হয়- তোকে ধরব, বটি দিয়ে কাটব, রান্না করে খাব ইত্যাদি। *"মাছকেই যে-কথা বলার, দরকারের সময় বাঘকেও সেই কথা বলা হয়, এখন জমি জবরদখলকারীকেও সেই একই কথা বলা হচ্ছে।"*[৫৭]

এই উপন্যাসে আমরা খেলাধুলাকেন্দ্রিক একটি লৌকিক ছড়ার বর্ণনা পাই। "একজন তার বাঁ পা ছড়িয়ে বসেছিল, তার পায়ের বুড়ো আঙুলটা চেপে ধরে আর-একজন তার হাতের বুড়ো আঙুলটা খাড়া রাখে, সেইটা আবার একজন ধরে। এই করতে যে পা মেলেছিল তাকে পাক দিয়ে সবাই ঘিরে ফেলে ছড়া বলতে শুরু করে। শেষ হলেই সবচেয়ে ওপরে যার হাত, সে হাত খুলে নেয়।

"নোকটুরে নটুয়া
বলদখানের খোটুয়া
বলদের প্যাটের তলত্
চৌদ্দ বাতি জ্বলত্
জ্বল্লুক ভ্যান্ডার ত্যাল্
তিত্লি খ্যাল্
ব্যাল গেইল্ পাকিয়া
ব্যাল গেইল্ ফাটিয়া
ব্যাল খাইল্ চাটিয়া
আয়রে বহিনী, আয় রে ভাই
দুধ মাখি ভাত খাই।"[৫৮]

উপন্যাসে রাজবংশীদের খাওয়া-দাওয়া নিয়ে একটি ছড়ার উল্লেখ রয়েছে। যা থেকে আমরা রাজবংশী জনগোষ্ঠীর প্রাত্যহিক আহারাদির বিবরণ পেয়ে থাকি।

"সকালের খোয়া খোকসা-ভাত

দুপহরের খোয়া মুড়ি
বিকেলের খোয়া চা আর চুড়া
সান্‌ঝার খোয়া ভারী।"[৫৯]

ছড়ার নানাবিধ শ্রেণীর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য হল ছেলেভুলানো ছড়া। এই ছড়াগুলি শিশু সম্পর্কিত হলেও এর রচয়িতা ও আবৃত্তিকার হলেন শিশুর জননী। শিশুর হৃদয়ের চঞ্চলতাকে শান্ত করার নিমিত্তেই এই জাতীয় ছড়ার সৃষ্টি। শিশুর মুখের ভাষা যতদিন পর্যন্ত অস্ফুট থাকে ততদিন জননী এই ছড়া বলে শিশুকে ভুলিয়ে রাখে। দেবেশ রায়ের 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'-এ এরকমই একটি ছেলেভুলানো ছড়ার উল্লেখ আছে। তবে উক্ত ছড়াটি কোনো জননীর কণ্ঠে উচ্চারিত নয়। ছড়াটি উপন্যাসের প্রধান চরিত্র বাঘারুর কণ্ঠে উচ্চারিত। ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন, মায়েরা সকাল বেলায় কোলের সন্তানকে চপচপে করে তেল মাখিয়ে সূর্যের দিকে ধরে দোলাতে দোলাতে এই ছড়া আবৃত্তি করে,—

"উঠেন উঠেন বেলা ঠাকুর চিকচিক্যানি দিয়্যা
উঠেন উঠেন বেলা ঠাকুর আগুন-টকটক হয়্যা
খুলি দিছু দেহবাড়ি ছ্যাঁকা দিয়্যা যান
জল যাউক, হিম যাউক, খাড়াউক শরীরখান।"[৬০]

ধাঁধা:

ধাঁধা লোকসাহিত্যের আর একটি অন্যতম শাখা হল। যখন কোনো একটি ভাবকে রূপকের সাহায্যে প্রশ্নের আকারে প্রকাশ করা হয় তখন তাকে ধাঁধা বলে। অর্থাৎ যেখানে প্রশ্নকর্তা উত্তর দাতার জন্য প্রশ্নের বর্ণনায় কিছু ইঙ্গিত দিয়ে থাকে। ধাঁধা লোকসমাজের অর্জিত অভিজ্ঞতার প্রশ্নবদ্ধ রূপ। যেখানে লোকসমাজের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। দেবেশ রায়ের 'তিস্তাপুরাণ' উপন্যাসে রয়েছে দু'টি ধাঁধার উল্লেখ—

ক) "হিতি গেনু, উতি গেনু, গেনু মরাঘাট
অ্যাকো গাছ দেখিবার ধইচছু ফলের উপর পাত।"[৬১]

উত্তর- আনারস

খ)" আই আই আই, ঘর আছে তার দুয়ার নাই।"[৬২]

উত্তর- ডিম

লোকসংগীত:

বাংলা লোকসাহিত্যের একটি সমৃদ্ধ ধারা হল লোকসংগীত। মৌখিক লোকসাহিত্যের অন্যান্য শিল্পের তুলনায় এর ব্যবহার লোকসমাজে ব্যাপক। যে সংগীত লোকসমাজের দ্বারা সৃষ্ট এবং লোকসমাজের দ্বারাই গীত হয়ে থাকে তাকেই আমরা লোকসংগীত বলি। লোকসংগীত হল মেহনতি মানুষের লোকায়ত ভাব, ভাবনা ও জীবনবৃত্তের সাংগীতিক প্রকাশ। লোকসংগীতে রচয়িতা বা গায়কের আলাদা কোনো স্থান নেই। এই সংগীত বৃহত্তর লোকসমাজের সম্পত্তি। লোকসমাজে এই সংগীত প্রথাগতভাবে শিখা হত না; লোকসমাজের প্রত্যেকটি মানুষই লোকসংগীতের গায়ক। সাধনময় ভট্টাচার্য লোকসংগীতের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—

> *"লোকসঙ্গীত হল লোকসমাজ কর্তৃক মুখে মুখে স্বতঃস্ফুর্তভাবে সৃষ্টি ও সুর সহযোগে গীত; সাধারণত কর্ম, প্রেম ও উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত একজাতীয় গান যা স্মৃতির মাধ্যমে বাহিত বলিষ্ঠ জীবনচেতনা ও সুরের ও গায়নরীতির আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ও মাটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগে জীবনমুখী।"*[৬৩]

বাংলা লোকসংগীতের বিভিন্ন শাখার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য শাখা হল 'ভাওয়াইয়া'। ভাওয়াইয়া গান 'দোতারার গান' নামেও পরিচিত। এই গান উত্তরবঙ্গের মানুষের কাছে খুবই জনপ্রিয়। এই গান রাজবংশী ভাষায় গাওয়া হয়, এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ভাঙা গলা। এই গানের মৌলিক বিষয় হল নর-নারীর প্রেম। বেশিরভাগ ভাওয়াইয়া গান রচিত হয় যুবতীর প্রেমবাসনা, মিলনের আকাঙ্ক্ষা, বিরহ যাতনা ইত্যাদি ভাব অবলম্বনে। তবে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, এই গানে নারীর বক্তব্য যদিও উপজীব্য বিষয় তথাপি এর রচয়িতা ও গায়ক সাধারণত পুরুষ। ভাওয়াইয়া গানে মূলত তিন শ্রেণীর পুরুষের উল্লেখ থাকে—মাহুত বন্ধু, গাড়িয়াল বন্ধু, মৈষাল বন্ধু।

'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' উপন্যাসে আমরা একটি মৈষাল বন্ধুর গান পাই, যে গানটি গায় উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র বাঘারু। বাঘারু তার মালিক গয়ানাথ জোতদারের বাড়ি থেকে নির্বাসিত হওয়ার পর, ডায়না নদীর তীরে অবস্থিত গয়ানাথের গরুর বাথানের কাজে নিযুক্ত হয়। সেই বাথানে একা কাজ করতে করতে বাঘারুর গলায় উঠে আসে মৈষাল বন্ধুর গান—

"বাথান বাথান করিসেন মইষাল রে-এ-এ
(অ তোর) বাথান করিলেন ঘর
বাথান হইলেন আউলা-ঝাউলা রে-এ-এ
(অ তোর) বাথান ভরা গোবর।
অ মোর মইষাল বন্ধু রে-এ-এ—

...বাঘারু তখন না-বাজানো দোতারার ঝোঁকে-ঝোঁকে গাইছে—

বাথানে বারোশ মইষ
ও মোর মহিষাল এ্যাকেলা ঘুরেন,
ঘরত্ মোর এই যৌবনখান্
কাপড়ে বান্ধি রাখেন।
অ-মোর মইষাল বন্ধু রে-এ-এ—"[৬৪]

এই গান তৈরি করতে বাঘারুকে কোনো প্রথাগত তালিম নিতে হয়নি। ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন—

> *"হাঁটা বা কথা শেখার মত করে এইসব গান জানা হয়ে গেছে—এমন সময়ে গাওয়ার জন্যে। মইষালনির এই বিরহ বাঘারুর, বাঘারুই মইষালনি। বিরহ তার, মইষাল বাঘারুর জন্যেই।"*[৬৫]

ভাওয়াইয়া গানের মূল সুর নর-নারীর প্রেম বিরহ হলেও সমসাময়িক সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিচয়ও পাওয়া যায় কিছু কিছু গানে। লোকসংগীত হল গ্রামকেন্দ্রিক, আর গ্রামে থাকে বেশিরভাগ খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষ। যারা যুগ যুগ ধরে নানাভাবে শোষিত হয়ে এসেছে—তালুকদার,

জোতদার, মহাজন, জমিদার, মজুমদার প্রভৃতি সমাজ শত্রুদের চক্রান্তে। এই শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে তাদের নানা প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের প্রতিফলন ঘটেছে অনেক লোকসংগীতেই। ১৯৫৫ সালের নতুন ভূমি সংস্কার আইন অনুসারে সরকার একজন ব্যক্তির নামে জমির পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দিয়ে অতিরিক্ত জমিকে খাসজমি হিসাবে ঘোষণা করে এবং খাসজমি ভূমিহীন কৃষকদের নামে নথিভুক্ত করার ব্যবস্থা নেয়। কিন্তু ভূস্বামীরা সরকারের এই আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নানা ফন্দিতে জমি নিজেদের দখলে রাখে। ফলে জমিদারদের বিরুদ্ধে দরিদ্র ভূমিহীন কৃষকেরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। অসহায় কৃষকেরা নিজেদের স্বার্থরক্ষার্থে নানাস্থানে জনসমাবেশ ও মিটিং-মিছিল করে। আলোচ্য উপন্যাসে এরকমই এক মিটিং-এ কৃষক নেতা হৃষীকেশের কণ্ঠে একটি প্রতিবাদী লোকসংগীত শোনা যায়—

"ও-ও আমার চরুয়া-হালুয়া ভাই
তোর গুণের সীমা নাই
তোর এতোখান্ জমিতে ভোখো না মেটে
তোর প্যাটের সীমা নাই।
ও-ও আমার চরুয়া-হালুয়া ভাই
তোর প্যাটের সীমা নাই
তোর গলার তলার প্যাটখান শরু
হাঁটুর তলায় যায়।"[৬৬]

'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' উপন্যাসে তিস্তা ব্যারেজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে বামফ্রন্টের নেতারা বিভিন্ন জায়গা থেকে গাড়িতে করে মানুষ নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে। তিস্তা ব্যারেজের উদ্দেশ্যে ছুটে চলা অসংখ্য গাড়িগুলির মধ্যে একটি গাড়ি থেকে আমরা দু'টি গান শুনতে পাই। ট্রাকের ওপর দুলতে দুলতে কান্নার সুরে দেবপাড়া চা-বাগানের মেয়েরা প্রথম গানটি গায়—

"মাসি, তুই আর ভাল কম্বল খুঁজিস না,
সব কম্বলে একই লোম,
সব লোমে একই উকুন,

সারা রাত জেগে থাকি আর উকুন কুটুস কুটুস করে কামড়ায়,
নাকি উকুন কামড়ায় বলেই সারা রাত জেগে থাকি।
মাসি তুই আর হাট থেকে
উকুন মারা তেল আনিস না
নইলে, সারা রাত আমাকে কামড়াবে,
এমন উকুন আর আমি কোথায় পাব ?
এমন উকুন আর আমি কোথায় পাব ?"[৬৭]

চা-বাগানের শ্রমিকরা সাধারণত বিহার, মধ্যপ্রদেশ থেকে আসা আশাহত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মানুষ। গানটির শব্দগুলি বাংলা হলেও মূল গানটি কি ভিন রাজ্য থেকে আসা মেয়েরা তাদের পূর্বপুরুষেদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছে? নাকি চা-বাগানে শ্রমিক হিশেবে যোগ দেব্যার পর দারদ্র্যক্লিষ্ট জীবনের বাস্তব চিত্র তুলে ধরতে পরবর্তীকালে সৃষ্ট হয়েছে? দ্বিতীয় গানটি গায় ট্রাকের পেছনে থাকা রাজবংশী মেয়েরা। যেটি একটি প্রেমের গান—

"আকাশ ত পরিষ্কার হয়ে গেল,
কাল মুরগিটা শাদা হয়ে গেল,
নাকি কাল মুরগিটাকে ঢাকা দিয়ে
শাদা মোরগটা তার পাখনা মেলে দিল
আর ঝুঁটিটা ফোলাল।
আর সারা রাতের পর তোর সময় হল রে বিদেশিয়া বন্ধু,
পান-সুপুরি নিয়ে আমার গোসা ভাঙানোর ?"[৬৮]

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের আরাধ্য দেবী হলেন 'তিস্তাবুড়ি'। এই দেবীর পূজার সঙ্গে গানের এক গভীর সম্পর্ক রয়েছে। তিস্তাবুড়ির পূজায় যে গান করা হয় তাকে মেচেনীর গান বলা হয়। এই গান ছাড়া তিস্তাবুড়ির পূজা সম্পন্ন হয় না। 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' উপন্যাসে একটি মেচিনী সংগীতের উল্লেখ আছে—

সগ্‌গ হতে নামিল্ তিস্তাবুড়ি
মনচে দিয়া পাওঁ

মনচ হতে নামিল্ তিস্তাবুড়ি
চ্যাতন করিল্ গাও
কাচা দুধ আলোয়া ক্যালো
ভইক্ষণ করো।"[৬৯]

এছাড়া 'তিস্তাপুরাণ' উপন্যাসেও রয়েছে একটি মেচেনী সংগীতের উল্লেখ—

"নামি আসিছে তিস্তাবুড়ি।
উঠি আসিছেন তিস্তাবুড়ি।
হীরামন বাঁশিখান বাজিবার ধরে
মোর মনখানত্ নাগিবার ধরে।
আরে উড়িয়া গেইল্ মোর গায়ের পছোরা।"[৭০]

প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগে উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ অঞ্চলই ছিল তৃণভূমি সম্বলিত জলাভূমি। এইসব অঞ্চলে তখন যাতায়াতের সুব্যবস্থা ছিল না। যাতায়াতের প্রধান মাধ্যম ছিল গরু বা মোষের গাড়ি, এছাড়া নদীপথে যাতায়াতের জন্য ছিল নৌকা। আর ধনী ব্যক্তিরা হাতির পিঠে চড়ে একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাতায়াত করত। ফলে নৌকার মাঝি (নাইয়া), হাতির মাহুত, গরু বা মোষের চালকদের (গাড়িয়াল) কর্মসূত্রে সারা বছরেই বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হত। পুরুষেরা জীবিকার প্রয়োজনে অন্যত্র চলে গেলে স্ত্রীরা সবসময় দুশ্চিন্তায় থাকত। প্রাণের মানুষটি দূরে গিয়ে যদি নিজের একাকীত্ব কাটাতে ঘরের স্ত্রীকে ভুলে অন্য কোনো নারীর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। 'তিস্তাপুরাণ' উপন্যাসে এরকমই এক মাঝির (নাইয়া) উদ্দেশ্যে তার স্ত্রী গান করে—

"ও পরানসাধুরে
বড়নদীর তালাশ করিবেন না।
মোর নদীখান ছোট, সেইঠে কাশিয়ার হুলুস্থুল
ঐঠে তোমরালার সোলোংগা বাঁধেন রে।
ও পরানসাধুরে।"[৭১]

মাহুতের উদ্দেশ্যে তার স্ত্রীর গাওয়া দু'টি বিরহ সংগীতের উল্লেখ পাওয়া যায় 'তিস্তাপুরাণ' উপন্যাসে—

(ক) "ও মোর দাঁতাল হাতির মাহুত রে
যেদিন মাহুত শিকার যায়, নারীর মন ঝুরিয়া রয় রে।
ও কি ও মোর সারিন হাতির মাহুত রে
যেদিন মাহুত উজান যায়, নারীর মন পুড়িয়া রয় রে।
ও কি ও মোর মাখনা হাতির মাহুত রে
যেদিন মাহুত পুবত যায়, নারীর মন জ্বলিয়া যায় রে।
ও কি ও মোর টুই হাতির মাহুত রে
যেদিন মাহুত জঙ্গল যায়, নারীর মন কান্দিয়া রয় রে।"[৭২]

(খ) "ঐ গদাধরের পারে পারে রে, ও মোর মাহুতে চরায় হাতি
কী মায়া লাগাইলেন মাহুত রে, ও তোর গলায় রসের কাঠি।
কী মায়া লাগাইলেন মাহুত রে।
ওরে উঁচা করি বান্ধেন ছাপোর রে, ও মুই আইসতে-যাইতে দেখিম্
ওরে উঁচা করি বান্ধেন মাচা রে, ও মুই জল ভরিতে দেখিম্—"[৭৩]

ভাওয়াইয়া গান যেমন স্বকীয়া প্রেম নিয়ে রচিত হয়েছে তেমনি পরকীয়া প্রেম নিয়েও রচিত হয়েছে প্রচুর ভাওয়াইয়া গান। সরল সাধারণ গ্রাম্য কবিরা তাদের রচনায় পরকীয়া প্রেমের প্রবল আকর্ষণকে অস্বীকার করেন নি। এক সময় রাজবংশী সমাজে মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। অপরিণত বয়সে বিয়ে হওয়ার কারণে বা স্বামীর সঙ্গে বয়সের অনেক তফাত হওয়ায় মেয়েরা পরকীয়া প্রেমে জড়িয়ে পরতো। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই সম্পর্কগুলি তৈরি হত সমবয়সী দেবরের সঙ্গে। উপন্যাসে আমরা এরকমই একটি গানের পরিচয় পাই। যেখানে বৌদি তার দেবরের উদ্দেশ্যে গান করে—

"চ্যাংড়াবান্ধার হাটতে ঘুনি ফোতা বেড়াইছে।
ঘুনিফোতার বড়ই সুনাম।

কোটত গেইলেন ভাবের দেওরা, মোর কচু খুঁড়ি দেন।
সরু করি কচুখান কুটিম
নুনে-তেলে কচুখান রান্ধিম।
কোটত গেইলেন ভাবের দেওরা, শাখ চাখিয়া যান।[৭৪]

ভাওয়াইয়া সংগীতে মাহুতের গানের পাশাপাশি হস্তিকন্যার গানও একটি বড় জায়গা করে নিয়েছে। উত্তরবঙ্গে এক সময় বুনো হাতি ধরে পোষ মানানোর জন্য গান গাওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। রীতি অনুসারে গানে মাহুতেরা হাতিকে (স্ত্রী বা পুরুষ যাই হোক) হস্তিকন্যা বলে সম্বোধন করত। এই সম্বোধনের মূল কারণ হল হাতির মন পাওয়া। 'তিস্তাপুরাণ' উপন্যাসে ঔপন্যাসিক এরকমই একটি গানের উল্লেখ করেছেন। তবে সে গানটি কোনো মাহুতের গাওয়া নয়, সেটি গেয়েছে মাহুতের স্ত্রী—

"হস্তীর কন্যা, হস্তীর কন্যা, বামুনের নারী,
মাথায় নিয়া তামকলসী, ও সখী, হস্তে সোনার ঝারি।
সখি ও, ও মোর হস্তীকন্যা রে
খানিক দয়া নাই মাহুতের লাগিয়া রে।
শুভক্ষণ দেখি কন্যা বাড়ি দিলেন পাও
মাথার উপর কালচিটি, করে পঞ্চরাও।
বালুটিলাটিল পঙ্খি কান্দে বালুতে পড়িয়া
মুই নারী কান্দো সখি ঘরবাড়ি ছাড়িয়া।"[৭৫]

এই হস্তিকন্যা বলে সম্বোধনের পিছনে রয়েছে কিংবদন্তি। ঔপন্যাসিক দেবেশ রায় লিখেছেন, দশবিশ নদীর পৃথিবীর কোনো এক নদীর পাড়ে ছোট কুঁড়ে ঘরে বাস করত জয়নাথ নামে এক ব্রাহ্মণ ও তার সুন্দরী স্ত্রী জয়মালা। জয়নাথের কাজ ছিল আশপাশের গ্রামে গিয়ে যজমানি করা। আর জয়মালা বাড়িতে বসে চরকায় পৈতের সুতো কাটত। এই সামান্য উপার্জনে তাদের দিন কাটছিল পরম সুখে। একদিন পার্শ্ববর্তী গ্রামের এক অর্থবান ব্রাহ্মণ মারা গেলে তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য জয়নাথকে সেখানে যেতে হয়। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার যাবতীয় কাজ চুকে গেলে ব্রাহ্মণের

স্ত্রী জনয়নাথকে চেপে ধরে, তার মেয়েকে বিয়ে করতে হবে আর বিয়ের পর সমস্ত সম্পত্তি পাবে জয়নাথ। সম্পত্তির লোভ এঁড়াতে না পেরে জয়নাথ ব্রাহ্মণের কুদর্শনা মেয়েকে বিয়ে করে বাড়ি নিয়ে আসে। নতুন বৌ বাড়িতে আসার কিছুদিন পরেই কুঁড়ে ঘরের পাশে তৈরি হয়ে যায় তিন-মহলা বাড়ি। সেইসঙ্গে নতুন বাড়িতে আসে অনেক ঝি-চাকর। কিন্তু জয়মালার জীবনের কোনো পরিবর্তন হয় না। তাকে চরম দুঃখ দুর্দশায় দিন কাটাতে হয়। নতুন বৌ তাকে একটা সোনার ঝাড়ি দেয়। সেই ঝাড়ি করে তাকে রোজ নদী থেকে জল এনে দিতে হত। দিনের শেষে পেত আঁকড়া চালের ভাত। কিন্তু জয়মালা সতীনের দেওয়া খাবার খেত না। বনের পশু পাখিরা তাকে যে ফল মূল এনে দিত, তা দিয়ে তার পেট ভরে যেত। নদীতে জল আনতে গিয়ে জয়মালা নদীর পাড়ে বসে শুধু কাঁদত। আর তার চোখের জল তার গাল বেয়ে, মাটি বেয়ে, নদীর জলে মিশত। হাতির রাজা কানজি হাতি একদিন সেই নদীর ভাটিতে জল খেতে খেতে বোঝে জলে কেমন নোনা স্বাদ। সে তার সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করে, জলের স্বাদ নোনা কেন? কানজির সঙ্গীরা জানায়, নদীর উজানে বসে এক মেয়ে রোজ কাঁদে, তার চোখের জলে নদীর জল নোনা হয়ে গেছে। কানজি তখনই নদীর উজানে ছুটে গিয়ে জয়মালার সামনে দাঁড়ায়। মাথায় তামার কলসী, হাতে সোনার ঝারি নিয়ে পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জয়মালা তার দুঃখের বৃত্তান্ত শোনায় কানজিকে। জয়মালার দুঃখের কথা শুনে কানজি নিজের চোখের জল সামালাতে পারে না। এদিকে হঠাৎ নদীর জল বেড়ে গিয়ে তিন-মহলা বাড়ি আর বন-বাদার ভেসে যায়। মুহূর্তের মধ্যে কানজি জয়মালাকে তার শুঁড়ে বসিয়ে নিয়ে নদীতে ভাসতে ভাসতে ভুটান পাহাড়ে তৈরি হাতিদের রাজপ্রাসাদে নিয়ে যায়। সেখানে গিয়ে কানজি জয়মালাকে সিংহাসনে বসিয়ে দেয়। হাজার হাজার হাতির অভিবাদন পর্ব শেষ হলে হস্তিরাজ নতুন রানিকে মাথায় নিয়ে এক ঝর্ণার কাছে নিয়ে যায়। ঝর্ণার সাতরঙা জল জয়মালার মাথায় পড়তেই জয়মালা হয়ে উঠে এক সুন্দর হস্তিনী। তার মাথার তামার কলসটি কপালে ঘটের আকৃতিতে এবং হাতের সোনার ঝারি সোনালী বর্ণের শুঁড়ে পরিবর্তিত হয়। সেই থেকেই রাজার নির্দেশে এই হস্তিনী হয়ে ওঠে বুনো হাতির দলের প্রধান। সে-ই

দলের পরিচালিকা। তার নির্দেশেই সকলে কাজ করে। তাই বুনো হাতি ধরে পোষ মানানোর সময় তার মন পেতে হস্তীকন্যা বলে সম্বোধন করা হয়।

উল্লেখপঞ্জি

১। সান্যাল চারুচন্দ্র, The Rajbansis of North Bengal, The Asiatic society, 2nd edition 2002, P. 162.

২। রায় গিরিজাশঙ্কর, উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির পূজা-পার্বণ, এন. এল. পাবলিশার্স, ডিব্রুগড়, আসাম, দ্বিতীয় প্রকাশ ১৯৯৯, পৃ. ১০২।

৩। রায় দেবেশ, মফস্বলি বৃত্তান্ত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, পরিবর্ধিত দে'জ সংস্করণ এপ্রিল ১৯৮৯, পৃ. ১১৬।

৪। তদেব, পৃ. ১১৬।

৫। তদেব, পৃ. ১১৭।

৬। তদেব, পৃ. ১১৮।

৭। তদেব, পৃ. ১২১-১২২।

৮। তদেব, পৃ. ৪৪।

৯। তদেব, পৃ. ৪৫।

১০। তদেব, পৃ. ৪৯।

১১। তদেব, পৃ. ৪৯।

১২। তদেব, পৃ. ৪৯।

১৩। নায়ক জীবেশ, লোকসংস্কৃতিবিদ্যা ও লোকসাহিত্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ২০১০, কলকাতা-০৯, পৃ. ১০৫।

১৪। রায় গিরিজাশঙ্কর, উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির পূজা-পার্বণ, এন. এল. পাবলিশার্স, ডিব্রুগড়, আসাম দ্বিতীয় প্রকাশ ১৯৯৯ পৃ. ১৫৬।

১৫। রায় দেবেশ, তিস্তাপারের বৃত্তান্ত, দে'জ পাবলিশং, কলকাতা-৭৩, ষোড়শ সংস্করণ জুলাই ২০১১, পৃ. ৪২৫।

১৬। রায় দেবেশ, তিস্তাপুরাণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ ২০০০, পৃ. ৬৮।

১৭। রায় দেবেশ, তিস্তাপারের বৃত্তান্ত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, ষোড়শ সংস্করণ জুলাই ২০১১, পৃ. ৪২৫।

১৮। রায় দেবেশ, তিস্তাপুরাণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ ২০০০, পৃ. ১৩৬।

১৯। রায় পবিত্র, রাজবংশি সমাজে প্রচলিত বাঁশ-পূজা: প্রেক্ষিত বঙ্গ-আসাম সীমান্ত অঞ্চল, অনুরণন, Vol. 2, Issue 2, 2014 পৃ. ৮।

২০। রায় দেবেশ, তিস্তাপুরাণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ ২০০০, পৃ. ৭১।

২১। নাথ প্রমোদ, অদিবাসী জনজীবনে পূজা-পার্বণ, অর্পিতা প্রকাশনী, কলকাতা-১২, প্রকাশ ৫ ডিসেম্বর, ২০০৮, পৃ. ৯১।

২২। রায় দেবেশ, তিস্তাপুরাণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ ২০০০, পৃ. ৪৬৯-৪৭০।

২৩। ভৌমিক নির্মলেন্দু, প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোকসংগীত, অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১১, পৃ. ১০৫।

২৪। রায় দেবেশ, তিস্তাপুরাণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ ২০০০, পৃ. ৪০৬।

২৫। তদেব, পৃ. ৪০৭।

২৬। তদেব, পৃ. ৪০৭।

২৭। তদেব, পৃ. ৪০৭।

২৮। তদেব, পৃ. ৪০৬।

২৯। তদেব, পৃ. ৪০৮।

৩০। তদেব, পৃ. ৪০৮।

৩১। তদেব, পৃ. ৪১০।

৩২। তদেব, পৃ. ৪০৯।

৩৩। করণ সুধীরকুমার, সীমান্ত বাঙলার লোকযান, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৯, দ্বিতীয় সংস্করণ-পৌষ, ১৪০২, পৃ. ১৪২-১৪৭।

৩৪। Frazer Sir James George, The Golden Bough A Study of Magic and Religion, Third edition, Macmillan and co.ltd. London, http://manybooks.net/, P. 21.

৩৫। রায় দেবেশ, মফস্বলি বৃত্তান্ত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, পরিবর্ধিত দে'জ সংস্করণ এপ্রিল ১৯৮৯, পৃ. ৩৭।

৩৬। রায় দেবেশ, তিস্তাপুরাণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ ২০০০, পৃ. ৮২।

৩৭। তদেব, পৃ. ৫৩৪।

৩৮। তদেব, পৃ. ৫৫৫।

৩৯। তদেব, পৃ. ৫৫৬।

৪০। তদেব, পৃ. ৫৫৮।

৪১। রায় দেবেশ, তিস্তাপারের বৃত্তান্ত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, ষোড়শ সংস্করণ জুলাই ২০১১, পৃ. ৯৪।

৪২। তদেব, পৃ. ৯৫।

৪৩। গিরি সত্যবতী ও মজুমদার সমরেশ(সম্পা), প্রবন্ধ সঞ্চয়ন, রত্নাবলী, কলকাতা-০৯, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৫ এপ্রিল ২০০৯, পৃ. ৩২।

৪৪। সিদ্দিকী আশ্‌রাফ, লোক-সাহিত্য- দ্বিতীয় খণ্ড, গতিধারা, ঢাকা-১১০০, প্রথম প্রকাশ ২০০৮, পৃ. ৩৩।

৪৫। রায় দেবেশ, মফস্বলি বৃত্তান্ত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, পরিবর্ধিত দে'জ সংস্করণ এপ্রিল ১৯৮৯, পৃ. ৩১।

৪৬। তদেব, পৃ. ৬৮।

৪৭। রায় দেবেশ, তিস্তাপুরাণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ ২০০০, পৃ. ২২৮।

৪৮। তদেব, পৃ. ২২৮।

৪৯। তদেব, পৃ. ২২৬।

৫০। তদেব, পৃ. ২২৯।

৫১। তদেব, পৃ. ৩৩০।

৫২। তদেব, পৃ. ২৯৪।

৫৩। তদেব, পৃ. ৬৩।

৫৪। তদেব, পৃ. ২৯৬।

৫৫। রায় দেবেশ, মফস্বলি বৃত্তান্ত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, পরিরর্ধিত দে'জ সংস্করণ এপ্রিল ১৯৮৯, পৃ. ৯১।

৫৬। রায় দেবেশ, তিস্তাপুরাণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ ২০০০, পৃ. ৩১৬।

৫৭। তদেব, পৃ. ৩১৬।

৫৮। তদেব, পৃ. ৭৫।

৫৯। তদেব, পৃ. ১৯১।

৬০। রায় দেবেশ, তিস্তাপারের বৃত্তান্ত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, ষোড়শ সংস্করণ জুলাই ২০১১, পৃ. ১২৯।

৬১। রায় দেবেশ, তিস্তাপুরাণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ ২০০০, পৃ. ৭৮।

৬২। তদেব, পৃ. ৭৮।

৬৩। চৌধুরী দুলাল, বাংলা লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ, আকাদেমি অব ফোকলোর, কলকাতা-৯৪, প্রথম প্রকাশ ২০০৪, পৃ. ১৩৮।

৬৪। রায় দেবেশ, তিস্তাপারের বৃত্তান্ত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, ষোড়শ সংস্করণ জুলাই ২০১১, পৃ. ১৬৭।

৬৫। তদেব, পৃ. ১৬৭।

৬৬। তদেব, পৃ. ৭৪।

৬৭। তদেব, পৃ. ৪৭৪।

৬৮। তদেব, পৃ. ৪৭৫।

৬৯। তদেব, পৃ. ৪২৫।

৭০। রায় দেবেশ, তিস্তাপুরাণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ ২০০০, পৃ. ৬৮।

৭১। তদেব, পৃ. ৯৯।

৭২। তদেব, পৃ. ৬৪৯-৬৫০।

৭৩। তদেব, পৃ. ৬৫১।

৭৪। তদেব, পৃ. ২৩০।

৭৫। তদেব, পৃ. ৬৫৪।